কপোতাক্ষ নদের সমস্যা সমাধানে জনগণের পরিকল্পনা

পানি কমিটি

সহযোগিতায় : উত্তরণ ও একশনএইড

কপোতাক্ষ নদের সমস্যা সমাধানে জনগণের পরিকল্পনা

হাসেম আলী ফকির

পানি কমিটি
মার্চ-২০০৯

উত্তরণ

actionaid bangladesh

সহযোগিতায়: উত্তরণ ও একশনএইড

কপোতাক্ষ নদের সমস্যা সমাধানে জনগনের পরিকল্পনা

প্রকাশ কাল: মার্চ-২০০৯

সার্বিক তত্ত্বাবধানে: শহিদুল ইসলাম
পরিচালক, উত্তরণ।

রচনা: হাসেম আলী ফকির
পরামর্শক, উত্তরণ ও সদস্য পানি কমিটি।

সার্ভে টীম:
অধ্যক্ষ এবিএম সফিকুল ইসলাম, সভাপতি, কেন্দ্রীয় পানি কমিটি ।
মাষ্টার আবুল কাশেম, সেক্রেটারী, কেন্দ্রীয় পানি কমিটি।
মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম, সদস্য,তালা উপজেলা পানি কমিটি।
শিক্ষক মায়নুল ইসলাম, সভাপতি, তালা উপজেলা পানি কমিটি।
মীর জিল্লুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক, তালা উপজেলা পানি কমিটি।
নারায়ন মজুমদার, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, তালা উপজেলা পানি কমিটি।
অধ্যক্ষ এনামুল ইসলাম,সদস্য, তালা উপজেলা পানি কমিটি।
প্রভাষক রেজাউল করিম, সদস্য, পাইকগাছা উপজেলা পানি কমিটি।
সাংবাদিক আব্দুল আলীম, সদস্য, তালা উপজেলা পানি কমিটি।
সফিকুল ইসলাম, পরিচালক, রূপালী ও সদস্য, তালা উপজেলা পানি কমিটি।
গোবিন্দ ভদ্র, সদস্য, তালা উপজেলা পানি কমিটি।
মেম্বর অজিত সরকার, সদস্য, তালা উপজেলা পানি কমিটি।
আব্দুর রাজ্জাক, রূপালী।
দিলীপ কুমার সানা, উত্তরণ ও
সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন সমূহের ইউপি সদস্যবৃন্দ।

মানচিত্র অংকন: রেসাদ মোঃ একরাম আলী।

অক্ষর বিন্যাস: মজুমদার কম্পিউটারস, চুকনগর বাজার, ডুমুরিয়া, খুলনা।

ছবি সংগ্রহ : দিলীপ কুমার সানা, সুপারভাইজার, উত্তরণ।

সার্বিক সহযোগিতায়:
আখতার হোসেন, সহ-সমন্বয়কারী, উত্তরণ।
সন্জয় রায়, একাউন্টস অফিসার, উত্তরণ।
সহদেব কুমার দত্ত, প্রোগ্রাম অফিসার (মনিটরিং), উত্তরণ।
দিলীপ কুমার সানা, সুপারভাইজার, উত্তরণ ।
গৌরাঙ্গ নন্দী, উত্তরণ।

মুদ্রণ: প্রচারণী প্রিন্টিং প্রেস,
৪৪, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা। ০৪১-৮১০৯৫৭

ডিজাইন ঃ অংকুর,
৪৪, স্যার ইকবাল রোড, খুলনা। ০৪১-৮১৩৮৬০

প্রকাশনা: উত্তরণ
৪২, সাতমসজিদ রোড (৩য় তলা)
ধানমন্ডি, ঢাকা-১২০৯।
মোবাইল: ০১৭১১-১৮২৩৪৪

আর্থিক সহায়তায়: একশনএইড বাংলাদেশ।

প্রকাশনা বিষয়ক কথা

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য দেশের অন্যান্য এলাকা থেকে একেবারে ভিন্নধর্মী। এ এলাকার জলাভূমি, সুন্দরবন ও সমৃদ্ধ প্রাণ-বৈচিত্র্যের কথা বিবেচনা না করে অতীতে অনেক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে; এর ধারাবাহিকতায় বর্তমানেও বহু প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এসব প্রকল্পের মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী সুফল পাওয়া গেলেও পরিণামে এলাকার পরিবেশ-প্রতিবেশে মারাত্মক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে; যার ফলে এলাকা এখন ধ্বংসের মুখোমুখি। বর্তমানে আর একটি বিপদ ভয়ানক গতিতে আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে, যা ইতিমধ্যে আমরা আঁচ করতে শুরু করেছি, তা হচ্ছে জলবায়ূ পরিবর্তন তথা সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। এই প্রেক্ষাপটে আমরা যদি অবিলম্বে পরিবেশ সম্মত কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ না করি, তবে অচিরেই এলাকাটি মনুষ্যবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে।

আমরা সকলেই জানি, এই এলাকাটি কপোতাক্ষ অববাহিকায় গড়ে উঠেছে। কপোতাক্ষ একটি প্রাচীন নদ। এর দু'পাড়ে, বাঁকে-বাঁকে রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস-ঐতিহ্য। সেই নদটি এখন প্রায় বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হয়েছে। এ নদী অববাহিকায় প্রতি বছর জলাবদ্ধতা ও বন্যার তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। দ্রুতহারে পলিজমে নদী ভরাট হচ্ছে এবং তা ভূমিদস্যুদের দখলে চলে যাচ্ছে। এলাকার মানুষদের ভোগান্তি ও অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট এখন সকল ধরনের সহনশীলতা অতিক্রম করে চলেছে।

কপোতাক্ষ নদ পুনরুজ্জীবনের জন্য অতীতে সরকার তথা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে যেসব কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হয়েছে তাতে এলাকার প্রকৃত সমস্যার কোন সমাধান হয়নি। এথেকে স্পষ্ট যে, ঐ একই ধরনের কর্মসূচী পুনরায় বাস্তবায়ন করে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়। বরং এতে সমস্যার পরিধি ও জটিলতা আরো বাড়বে। এখন প্রয়োজন এলাকার পরিবেশ-প্রতিবেশ বিবেচনা করে জনগণের মতামত সাপেক্ষে একটি স্থায়িত্বশীল পানি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা। জনগণের মতামতের ভিত্তিতে আমাদের মনে হয়েছে, কপোতাক্ষ নদ অববাহিকার জলাবদ্ধতা ও পানি নিষ্কাশনের সমস্যা সমাধানের জন্যে জরুরী, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী টেকসই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে হবে। যেমন:

১. কপোতাক্ষ নদের যে অংশে জোয়ার-ভাটা কার্যকর রয়েছে অর্থাৎ উত্তরে তালা থেকে দক্ষিণে শিববাটি পর্যন্ত জোয়ার-ভাটা বজায় রাখতে চলতি মৌসুমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
২. সুড়িঘাটা-ধানদিয়া থেকে কপিলমুনির নিম্নভাগ জেঠুয়া পর্যন্ত অতি সত্ত্বর নদী খনন করে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে হবে। তা নাহলে আগামী বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করবে।
৩. নাব্য বজায় রাখা ও নদীর প্রবাহ বৃদ্ধি করতে জলাধার তৈরি বা টিআরএম বাস্তবায়ন করতে হবে, যাতে পলি নদীতে অবক্ষেপিত না হয়ে জমিতে অবক্ষেপিত হতে পারে।
৪. নাব্য বজায়/বৃদ্ধির জন্যে যতোটা সম্ভব নদীর বাঁক সোজা করার জন্যে লুপকাট করতে হবে।
৫. নদী থেকে সকল ধরণের দখল মুক্ত ও অবকাঠামোসমূহ উচ্ছেদ করতে হবে এবং নদীর উপর অপরিকল্পিত ব্রীজ-সাঁকো অপসারণ করে নদীর প্রবাহ বজায় থাকে এমন ধরণের ব্রীজ-সাঁকো নির্মাণ করতে হবে।
৬. নদীর সাথে সংযোগ খাল/চ্যানেল ড্রেজিং এবং কালভার্ট ও গেইটসমূহ সংস্কার করতে হবে।
৭. দীর্ঘ ও মধ্যমেয়াদী ব্যবস্থা হিসেবে কপোতাক্ষ ও তার উজানে ভৈরব নদীর দর্শনা পর্যন্ত এই প্রতিবেদনে সংযুক্ত মানচিত্র অনুযায়ী অংশবিশেষ খনন করতে হবে এবং দর্শনা বা সুবিধাজনক কোন স্থান থেকে মাথাভাঙ্গা নদীর সাথে কপোতাক্ষ অববাহিকার পুন:সংযোগ স্থাপন করতে হবে।

উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো দ্রুত গৃহীত না হলে এই জনপদে অচিরেই মারাত্মক বিপর্যয় নেমে আসবে। তাতে জান-মাল ক্ষতিসহ কয়েক লাখ মানুষ পরিবেশ উদ্বাস্তুতে পরিণত হবে। দীর্ঘ সময় ধরে এলাকাবাসীর মতামত ধারণ করে জনাব হাসেম আলী ফকির এই পুস্তিকাটি প্রণয়ন করেছেন। রেশাদ মোঃ ইকরাম আলী এলাকাবাসীর স্বার্থে এই পুস্তিকার জন্যে মানচিত্র তৈরি করে দিয়েছেন। মোড়ল আব্দুস সালাম, শিক্ষক মায়নুল ইসলাম, মাস্টার আবুল কাশেম, অধ্যক্ষ এনামুল ইসলাম, প্রভাষক রেজাউল করিম, মীর জিল্লুর রহমান, নারায়ণ মজুমদার, রূপালী'র পরিচালক শফিকুল ইসলাম, সাংবাদিক আব্দুল আলীমসহ পানি কমিটির সকল সদস্য ও সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদসমূহের অগণিত মানুষ পরিকল্পনাটি প্রণয়নে শ্রম ও সময় দিয়ে ভূমিকা রেখেছেন। উত্তরণ ও পানি কমিটির যৌথ এই কাজটি বাস্তবায়নে একশনএইড বাংলাদেশ সহযোগিতা করেছে। সকলকে আমাদের অভিনন্দন। জনগণের ক্ষয়ক্ষতি ও এলাকার পরিবেশ-প্রতিবেশ বিবেচনায় রেখে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, এটাই প্রত্যাশা।

শহিদুল ইসলাম
পরিচালক
উত্তরণ

অধ্যক্ষ এবিএম শফিকুল ইসলাম
সভাপতি
পানি কমিটি

সূচিপত্র

ক্রমিক		পৃষ্ঠা নং
১.	ভূমিকা	০৫
২.	মাথাভাঙ্গা নদী	০৫
৩.	রেলপথ চালু	০৬
৪.	কপোতাক্ষ নদ	০৭
৫.	২০০০ সালের বন্যা	১৫
৬.	২০০৮ সালের বন্যা ও জলাবদ্ধতা	১৫
৭.	ভাঙ্গন ও জোয়ারের প্লাবন	১৭
৮.	বন্যা, জলাবদ্ধতা ও নদী ভাঙ্গনের কারণ	১৭
৯.	সমস্যা সমাধানে উত্তরণ ও পানি কমিটির ভূমিকা	২২
১০.	সমস্যা সমাধানে সরকারী পদক্ষেপ	২৩
১১.	সমস্যা সমাধানে জনগণের দাবী ও প্রস্তাবনাসমূহ	২৪
১২.	অন্তবর্তীকালীন জরুরী নিষ্কাশন পরিকল্পনা	২৫
১৩.	টেকসই মধ্যবর্তী পরিকল্পনা	৩০
১৪.	দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ী সমাধানের জন্য পরিকল্পনা	৩৪
১৫.	জনগণের অংশগ্রহণ ও লোকায়ত জ্ঞানের ব্যবহার	৩৫
১৬.	উপসংহার	৩৬

১. *ভূমিকা:*

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলীয় জেলা যশোর-খুলনা ও সাতক্ষীরা অঞ্চলের মানুষের জীবন জীবিকা এখন ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এলাকার জীবনদায়িনী নদীগুলো ক্রমে ক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে, ফলে নিত্য নতুন এলাকায় ঘটে চলেছে জলাবদ্ধতার সম্প্রসারণ। দীর্ঘ ২৫-৩০ বৎসর যাবৎ জলাবদ্ধতায় আক্রান্ত বিল ডাকাতিয়া, ভবদহ এবং কপোতাক্ষ সমস্যা এখন জাতীয় সমস্যায় পরিগনিত হয়েছে। অতীতের সকল সরকারই কমবেশী এ সমস্যা সমাধানের জন্য অর্থ বরাদ্দ দিয়েছেন, বাস্তবায়ন করা হয়েছে বিভিন্ন প্রকল্প কিন্তু ভুল পদক্ষেপ ও জনগণকে কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত না করার দরুণ সমস্যার তেমন কোন সুরাহা হয়নি।

বর্তমানে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ভূমির অবনমন এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা যুক্ত হয়ে উপকূল অঞ্চল পরিবেশবিদদের কাছে আশংকার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষজ্ঞ মহল থেকে এ আশংকা ব্যক্ত করা হয়েছে যে, কার্যকরী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা না হলে অচিরেই উপকূল অঞ্চল সমুদ্র গর্ভে বিলীন হবে, বিপর্যস্ত হবে বিশ্ব ঐতিহ্যখ্যাত সুন্দরবন এবং এ অঞ্চলেই ঘটে যেতে পারে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ পরিবেশ বিপর্যয়ের মাইগ্রেশন। জলাবদ্ধ সমস্যা মোকাবেলার মাধ্যমে বহুলাংশে এসব সমস্যার সমাধান করা সম্ভব।

২. *মাথাভাঙ্গা নদী*

কপোতাক্ষ নদের সমস্যা ও সমাধানে করণীয় নির্ধারণের জন্য মাথাভাঙ্গা নদী সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা আবশ্যক। কেননা কপোতাক্ষ নদের উৎপত্তি ঘটেছে মাথাভাঙ্গা নদী থেকে। মাথাভাঙ্গা নদীর বিপর্যয়ের সাথে কপোতাক্ষ নদের বিপর্যয়ের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

মাথাভাঙ্গা নদী পদ্মার একটি প্রধান শাখা নদী। কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর উপজেলার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের মুন্সিগঞ্জ থেকে মাথাভাঙ্গা নদীর উৎপত্তি। নদীর অপর তীরে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলা। উৎপত্তিস্থল থেকে দর্শনার চেকপোস্ট পর্যন্ত নদীটির দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬০ কি.মি। যাত্রাপথে চুয়াডাঙ্গা জেলা সদর এবং দামুড়হুদা উপজেলা শহরের পাশ দিয়ে এ নদীটি প্রবাহিত হয়ে দর্শনার সুলতানপুর ও জয়নগর গ্রামের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে ইছামতি নামে প্রবেশ করেছে। কৃষ্ণগঞ্জে এসে এর একটি শাখা চূর্ণী নাম ধারণ করে ভাগীরথি নদীতে পতিত হয়েছে। অপর শাখা ইছামতি নামে অধিকাংশ জায়গায় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত নির্ধারণ করে সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে।

মাথাভাঙ্গার প্রধান শাখা নদী কুমার, নবগঙ্গা, চিত্রা এবং কপোতাক্ষ। ভৈরব নদী মাথাভাঙ্গার একটি উপনদী। ভৈরব নদী মেহেরপুর জেলার মধ্য দিয়ে দামুড়হুদা উপজেলার সুবলপুর ঘাটে এসে মাথাভাঙ্গার সাথে যুক্ত হয়েছে। এখান থেকে এই যুক্ত প্রবাহ মাথাভাঙ্গা নামে দর্শনা অভিমুখে প্রবাহিত হয়েছে। সুবলপুর থেকে দর্শনা পর্যন্ত এই যুক্ত প্রবাহের দূরত্ব ১৪ কি.মি।

বাংলার রাজস্ব আদায় ও দেওয়ানী ক্ষমতা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে চলে যাওয়ার পর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে মাথাভাঙ্গা নদীর গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। সে সময় বৃহত্তর কুষ্টিয়া জেলা ছিল নদীয়া জেলার অন্তর্গত। নদীয়া এবং বৃহত্তর যশোর জেলা ছিল বৃটিশদের বিচরণের মৃগয়াভূমি। প্রশাসন ও ব্যবসা বাণিজ্য সকল কাজই সম্পন্ন করা হতো নদী পথে। কর আদায় ও প্রশাসনিক কাজকর্ম ছাড়াও নীল চাষ এবং পরবর্তীতে চিনি আমদানী ও স্টীমার সার্ভিস চালু প্রভৃতি কারণে মাথাভাঙ্গা নদী ইংরেজদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে। কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গের সাথে যোগাযোগেরও প্রধান মাধ্যম ছিল মাথাভাঙ্গা নদী।

ইংরেজরা দেখলো বড়ো নৌকা গ্রীষ্মকালে মাথাভাঙ্গা নদীতে চলাচল করতে অসুবিধা হচ্ছে। মাঝারি এবং ছোট নৌকা চলাচলে তাদের প্রয়োজন মিটতো না। এ বিষয়ে জরীপ করার জন্য ১৭৭২ সালে মিঃ রেনেলকে নিয়োগ দেওয়া হয়। ১৭৮০ সালে মিঃ রেনেল নদ-নদীর একটি মানচিত্র প্রকাশ করেন এবং রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, নদীতে পলি জমার কারণে নৌ চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে।
১৭৯৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত নদী উন্নয়নের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানা যায় না। ১৭৮৭ সালে ভয়ংকর ভূমিকম্পের কারণে বিশেষ করে ব্রহ্মপুত্র ও গঙ্গানদী ব্যবস্থায় ব্যাপক উলট-পালট কাণ্ড ঘটে যায়।

ব্রহ্মপুত্র বর্তমান যমুনার স্রোতে প্রবাহিত হয় এবং এর সাথে যুক্ত হয় তিস্তা-করতোয়া-আত্রাই প্রভৃতি নদী স্রোত। যমুনার এই বিপুল জলরাশি গোয়ালন্দে গঙ্গার সাথে মিলিত হয়। এই পানির চাপে গঙ্গার পানি স্ফীত হয়। সম্ভবতঃ মাথাভাঙ্গায় এ সময় প্রচণ্ড স্রোত সৃষ্টি হয় যা রোধকল্পে বালি ভর্তি নৌকা ডুবিয়ে দেওয়া হয় মাথাভাঙ্গার মুখে। পরবর্তীতে পদ্মা প্রবাহের চাপে গড়াই যখন পদ্মার প্রধান শাখা নদীতে পরিণত হয় তখন আবারও মাথাভাঙ্গা নদীর সমস্যা দেখা দেয়।

১৮৬২ সালে রেলপথ চালু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মাথাভাঙ্গা নদীকে নৌ-চলাচলের উপযোগী করার জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো:

লুপকাটের মাধ্যমে নদীপথ সোজা করা।
নদীর দু'পাশ বেঁধে নদীখাত সংকীর্ণ করা।
শাখা নদীসমূহের প্রবাহ হ্রাস করা।
নদী ড্রেজিং করা।

লুপকাট: ১৭৯৫ সালে চুয়াডাঙ্গার বন্দরভিটা থেকে দামুড়হুদার সুবলপুর পর্যন্ত বিশাল বাঁকে সংযোগ খাল কেটে নদী সোজা করা হয়। ১৮১৯-২০ সালে দর্শনার বর্তমান পাইপঘাটা থেকে জয়নগর সুলতানপুর পর্যন্ত একটি খাল কেটে মাথাভাঙ্গার বাঁক সোজা করা হয়। একই সময়ে যশোরে চৌগাছার তাহিরপুরে কপোতাক্ষের বাঁক সোজা করা হয় ভৈবর নদীর সাথে সংযোগ দিয়ে। কপোতাক্ষ ও ভৈরবের রয়েছে অসংখ্য পরিত্যাক্ত বাওড়। এর অধিকাংশই সম্ভবতঃ লুপকাটজনিত বাওড়।

সংকীর্ণ করে নদীখাত গভীর করার উদ্যোগ: শুকনো মৌসুমে বা গ্রীষ্মকালে নৌ-চলাচল যাতে বিঘ্নিত না হয় তার জন্য ইংরেজ ইঞ্জিনিয়ররা উদ্যোগ গ্রহণ করে নদীখাত সংকীর্ণ করার। এ লক্ষ্যে নদীর দুইতীরে চাটাইয়ের বেড়া দিয়ে স্রোতের তীব্রতা কমিয়ে নদীর উভয়তীর বেঁধে ফেলা হয়। উদ্দেশ্য নদীতে উপত্যকা সদৃশ পাহাড়িয়া খাতের অনুরূপ খাত তৈরী করা যাতে নদীতে স্রোতের তীব্রতা বৃদ্ধি পেয়ে একটি নদীখাত সৃষ্টি হয়।

শাখা নদীর প্রবাহ হ্রাস: নদীখাত সংকীর্ণ করার উদ্যোগ নিলে দেখা গেল মাথাভাঙ্গায় প্রবাহিত অধিকাংশ পানি শাখা নদী বিশেষ করে কুমার নদীর মধ্যে প্রবেশ করছে। তখন প্রবাহ হ্রাস করার জন্য কুমার, নবগঙ্গা প্রভৃতি নদীর মুখে বালি বোঝাই বড় বড় নৌকা ডুবিয়ে দেওয়া হয় এবং নদীর উৎসমুখের দুইতীর বাঁধ দিয়ে সংকীর্ণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

নদী ড্রেজিং: মূলনদী ও শাখা নদীসমূহে হস্তক্ষেপ করে মাথাভাঙ্গার নদীখাত গভীর করা সম্ভব হলো বটে তবে কিছুকাল পর নদীখাতে আবারও পলি জমে নাব্যতার সংকট সৃষ্টি হয়। নদী থেকে পলি অপসারণের জন্য ১৮২৩ সালে সর্বপ্রথম বঙ্গদেশে গরুচালিত ড্রেজার মেশিন আনা হয়। ১৮২৮-২৯ সালে আরো উন্নত ধরণের স্টীমার চালিত ড্রেজার মেশিন সংগ্রহ করা হলো লণ্ডন থেকে। কিন্তু এ চেষ্টাও ব্যর্থতায় পর্যবসতি হলো। দেখা গেল অপসারিত পলি নদীর অন্য অংশে জমা হয়ে নদী ভরাট হচ্ছে।

ফলাফল: উপরোক্ত কার্যক্রমের দরুণ পরিনামে মাথাভাঙ্গা নদীর প্রবাহ হ্রাস পায় যার দরুণ মাথাভাঙ্গার উৎসমুখে পলি ভরাট হতে থাকে এবং শাখা নদীসমূহ শুকনো মৌসুমে মাথাভাঙ্গা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার উপক্রম হয়।

৩. *রেলপথ চালু*

১৮৬২ সালে রানাঘাট থেকে কুষ্টিয়া-গোয়ালন্দ রেলপথ চালু হয়। ইছামতি, ভৈরব, চিত্রা, নবগঙ্গা ও কুমার নদীর উপর দিয়ে এই রেলপথ নির্মিত হয়। ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য নদীসমূহের উপর অপ্রশস্ত রেলব্রীজ নির্মাণ করা হয়। এতে নদী যা অবশিষ্ট ছিল তারও ৭০-৮০ ভাগ সংকুচিত হয়ে পড়ে। ফলে মাথাভাঙ্গা থেকে শাখা নদীসমূহ বিশেষ করে শুকনো মৌসুমে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

নবগঙ্গা নদীর আমিরপুর ও খেজুরতলায় নদীর উপর ব্রীজ না করে মাটি দিয়ে নদী ভরাট করা হয়। ফলে নবগঙ্গা মাথাভাঙ্গা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

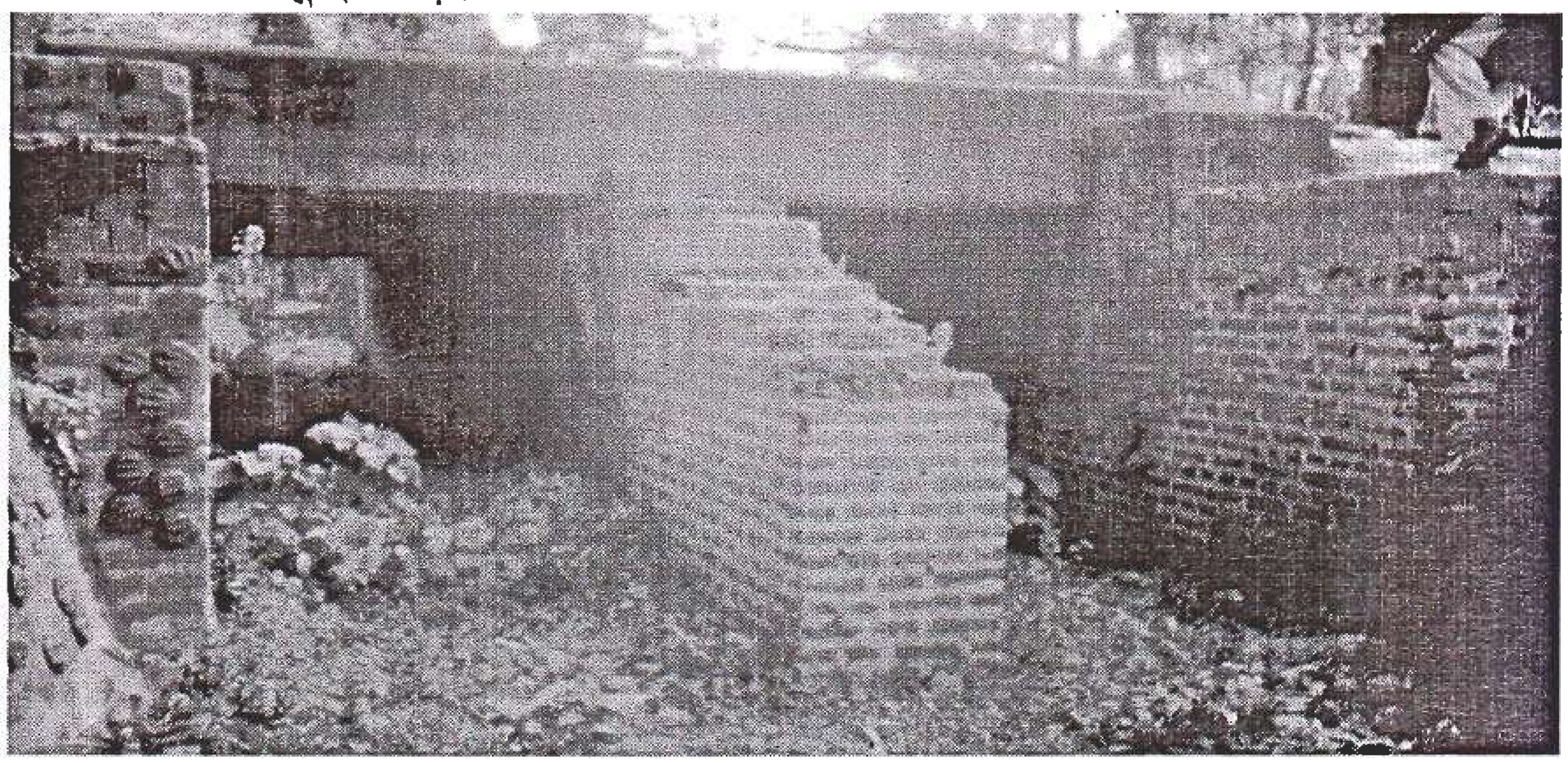

দর্শনার রেল ক্রসিং জংশনে নদীর উপর নির্মিত রেল ব্রীজ।

১৮৭২ সালে যশোর-খুলনা ও কুষ্টিয়া জেলায় নদী বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হওয়ার কারণে এলাকায় ব্যাপক ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে বলে সরকারী রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে রেলপথ চালু হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার নৌপথের সকল পৌত্তিক কাজ প্রায় বন্ধ করে দেয় এবং রেলপথ নির্মাণের পাশাপাশি সড়কপথ নির্মাণে মনোনিবেশ করে। রাজপথ রেলপথ নির্মাণের সময় নদী ও নিষ্কাশন খালগুলোকে আরো সংকুচিত করা হয় ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণ করে।

অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে নদীশাসন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য ব্রিটিশ সরকার যে ধরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সেই দৃষ্টিভংগী ও সেই ধরণের কর্মসূচী এখনও পর্যন্ত অব্যাহত আছে যা কিনা নদী রক্ষা ও নিষ্কাশন ব্যবস্থার জন্য খুবই ক্ষতিকর।

১৯০৯ সাল থেকে শুরু করে ১৯১৫ সালে পদ্মা নদীর উপর নির্মিত হয় পাঁকশী ব্রীজ। এ ব্রীজ নির্মিত হওয়ার পর ব্রীজের পোস্তগোলা বা পিলারের মধ্যে, আগে ও পিছে পলি ভরাট হয়ে পদ্মা নদীর প্রবাহে বিঘ্ন ঘটে। পাকশী ব্রীজ নির্মিত হওয়ার পর মাথাভাঙ্গা নদীর অবস্থা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এর সমাধানের জন্য বিখ্যাত সেচ বিজ্ঞানী উইলিয়ম কক্স ১৯২৮ সালে মাথাভাঙ্গার নিম্নে নদীয়া ব্যারেজের প্রস্তাব করেন। এ ব্যারেজ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল পদ্মা নদীর পানির উ"চতা ৭ ফুট বৃদ্ধি করে সেই পানি মাথাভাঙ্গার মধ্যে প্রবেশ করানো কিন্তু বিভিন্ন কারণে এ প্রস্তাব বাস্তবায়ন করা হয়নি।

১৯৭৪ সালে ফারাক্কা ব্যারেজ চালু হওয়ার পর পদ্মা নদীর বিপর্যয় চূড়ান্ত অবস্থার সম্মুখীন হয় এবং এর অভিঘাতে মাথাভাঙ্গা নদীর অবস্থা এখন সঙ্গীন হয়ে পড়েছে। মাথাভাঙ্গা এখন মাত্র বর্ষাকালে ৩/৪ মাস পদ্মা নদীর সাথে যুক্ত থাকে।

৪. কপোতাক্ষ নদ

কপোতাক্ষ মাথাভাঙ্গার অন্যতম শাখানদী। দর্শনার উপরে মাথাভাঙ্গা ও ভৈরবের যুক্তপ্রবাহ থেকে এ নদীর উৎপত্তি। এ নদী দামুড়হুদা ও চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নিম্নাংশ দিয়ে ভৈরবের সাথে মিলিত হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা জেলায় এ নদীর গতিপথ কোথাও বিচ্ছিন্ন আবার অনেক জায়গায় এর অস্তিত্ব খুঁজেও পাওয়া যায়। কিন্তু এ জেলায় কপোতাক্ষ আর স্বনামে পরিচিত নয়। ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর ও কোটচাঁদপুর উপজেলায় কপোতাক্ষ স্বনামে পরিচিত যদিও পানি উন্নয়ন বোর্ডের নথিপত্রে এ অংশকে ভৈরব নদী নামে অভিহিত করা হয়েছে। বর্তমানে চৌগাছার তাহিরপুর থেকে দর্শনা পর্যন্ত নদীকে ভৈরব নদী হিসাবে ধরা হচ্ছে। তাহিরপুর থেকে দর্শনার সীমান্ত চেকপোস্ট পর্যন্ত এ নদীর দূরত্ব প্রায় ১১০ কি.মি।

তাহিরপুর থেকে ভৈরব নিজ নামে পূর্ব দিকে যশোর অভিমুখী হয়েছে আর কপোতাক্ষ সোজা দক্ষিণমুখী হয়ে চৌগাছা, ঝিকরগাছা, ত্রিমোহিনী, তালা, কপিলমুনি, রাড়ুলী, চাঁদখালী, কয়রা, বেদকাশি হয়ে সুন্দরবনের মধ্যে আড়পাংগাসিয়া নদীর মাধ্যমে সমুদ্রের মালঞ্চ মোহনায় পতিত হয়েছে। পাইকগাছা উপজেলার রাড়ুলী থেকে ২৫/৩০ বৎসর পূর্বে কপোতাক্ষের নিম্নাংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। রাড়ুলী থেকে বেদকাশী সুন্দরবন পর্যন্ত এই বিচ্ছিন্ন অংশের দূরত্ব ৮২ কি.মি।

ব্রিটিশ আমলে রাড়ুলী থেকে একটি সংযোগ খাল কেটে পাইকগাছার শিববাড়ী শিবসার সাথে যুক্ত করা হয়। এখন কপোতাক্ষের নিম্নাংশ বলতে শিবসার শিববাড়ী পর্যন্ত বোঝানো হয়। ব্রিটিশ আমলে এই সংযোগ খালের সাথে লুপকাট করে আরও ২টি খাল যুক্ত করা হয় কপোতাক্ষের নিম্নাংশ কাটাখালী নামক খেয়াঘাটের সাথে। এ দুটি সংযোগ খালের নাম ইদুরকাটা ও সাহেবখালী খাল। ইদুরকাটা পলি জমে এবং মৎস্য ঘেরের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে। সাহেবখালী খাল মৃত্যুর অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। এখন কপোতাক্ষ নদী বলতে সরকারী ভাষায় বোঝানা হচ্ছে পাইকগাছার শিববাড়ী থেকে চৌগাছার তাহিরপুর পর্যন্ত যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১৭৫ কি.মি।

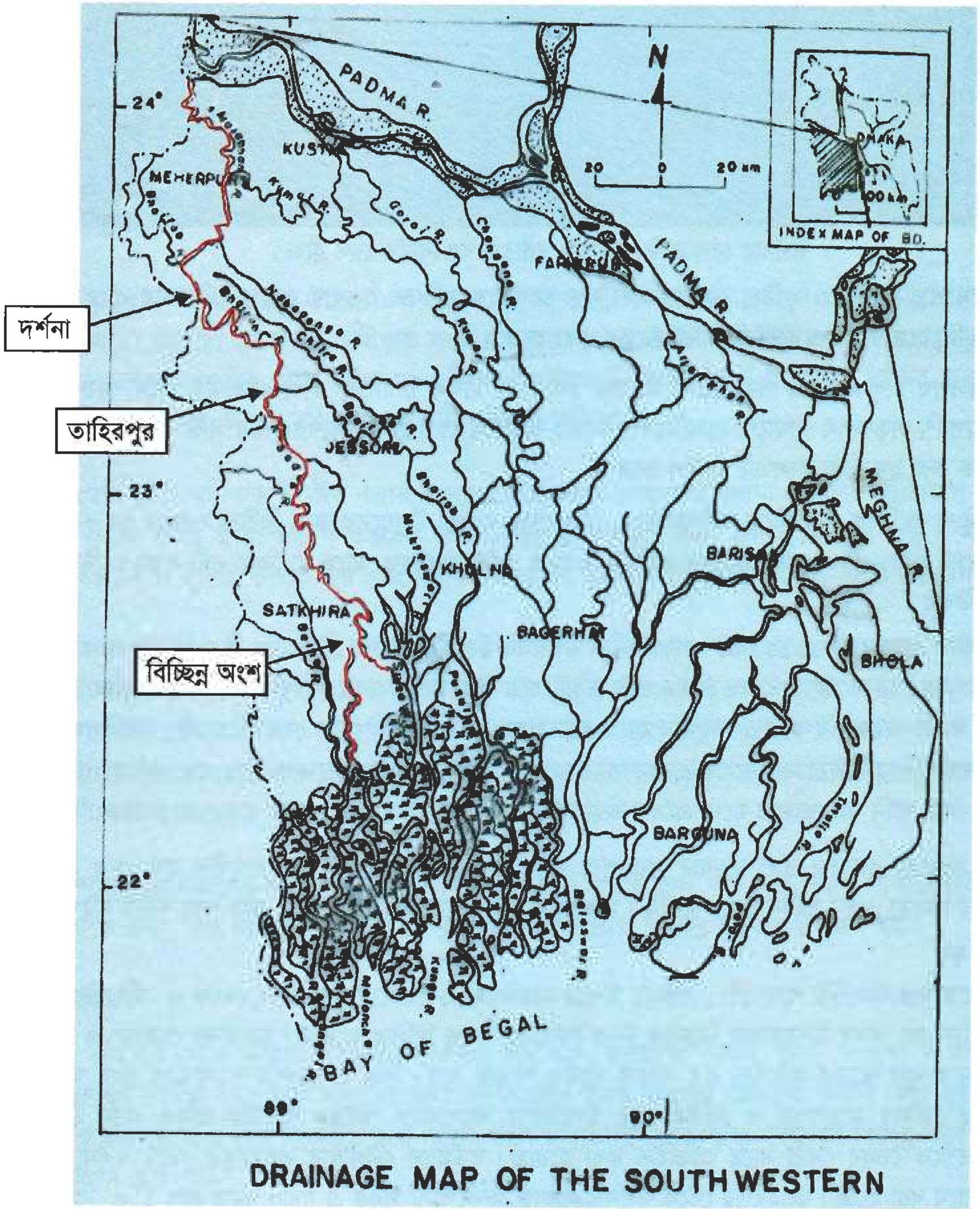

DRAINAGE MAP OF THE SOUTHWESTERN

৪.১ কপোতাক্ষের বিচ্ছিন্ন অংশ

বিচ্ছিন্ন অংশের পশ্চিমে সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার খেসরা ইউনিয়ন, আশাশুনি উপজেলার দরগাপুর, বড়দল, আনুলিয়া, খাজুরা, প্রতাপনগর ইউনিয়ন এবং শ্যামনগর উপজেলার গাবুরা ও পদ্মপুকুর ইউনিয়ন। পূর্ব অংশে খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার রাড়ুলী, চাঁদখালী, এবং কয়রা উপজেলার আমাদি, মহারাজপুর, বাগালী, কয়রা ও বেদকাশি ইউনিয়ন। অববাহিকার আয়তন ৭৪১০৮ হেঃ এবং নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী ৫৮৪৮৮২ জন।

কপোতাক্ষের বিচ্ছিন্ন অংশের ক্যাচমেন্ট
(রাড়ুলী থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত)

জেলা	*উপজেলা*	*ইউনিয়ন/ পৌরসভা*	*ক্যাচমেন্ট ভূক্ত এলাকা (হেঃ)*	*ক্যাচমেন্ট ভূক্ত গ্রাম সংখ্যা*	*নির্ভরশীল জনসংখ্যা*
খুলনা	পাইকগাছা	রাড়ুলী	৮০২	৪	১০৮২৩
		চাঁদখালী	৩৯৬৫	২৮	৩২২৯২
	মোট	*২টি*	*৪৭৬৭*	*৩২*	*৪৩১১৫*
	কয়রা	আমাদী	৪১৫১	২৭	৩৫৩৮০
		বাগালী	৪৮৫২	৩১	৩৬৫২৩
		কয়রা	৩৩৪০	৯	৩৫৭৯৭
		মহারাজপুর	৪২৪০	২৯	৩৩৫৭০
		উত্তর বেদকাশী	২২৪৪	১৩	১৫৮৯৫
		দক্ষিণ বেদকাশী	২৪১৭	১২	২১৩৬৯
	মোট	*৬টি*	*২১২৪৪*	*১২১*	*১৭৮৫৩৪*
জেলা মোট	*২টি*	*৮টি*	*২৬০১১*	*১৫৩*	*২২১৬৪৯*
সাতক্ষীরা	আশাশুনি	দরগাপুর	৫২০৪	৩২	২৯৮১৬
		বড়দল	৩৬৪৭	২৪	২৭৯৩৮
		খাজরা	৩৭২৫	২৫	২৬৪৪৬
		আনুলিয়া	২৮৫৫	২৪	২১৭৬৬
		প্রতাপনগর	৩৩৮৯	১৯	২৫৫০৬
	মোট	*৫টি*	*১৮৮২০*	*১২৪*	*১৩১৪৭২*
	শ্যামনগর	পদ্মপুকুর	৪০৯৫	১৪	২২৬০০
		গাবুরা	৩৯৩৮	১৬	৩০৬২৭
	মোট	*২টি*	*৮০৩৩*	*৩০*	*৫৩২২৭*
জেলা মোট	*২টি*	*৭টি*	*৪৮০৯৭*	*২৭৫*	৩৬৩২৩৩
সর্বমোটঃ ২টি	*৪টি*	*১৫টি*	*৭৪১০৮*	*৪২৮*	*৫৮৪৮৮২*

পোল্ডার ব্যবস্থার আওতায় অনেক শাখানদী-উপনদী বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে আশাশুনি সদর থেকে মরিচ্চাপ ও বেতনার যুক্ত প্রবাহ মরিচ্চাপ নামে বড়দলে এসে কপোতাক্ষের সাথে মিলিত হয়েছে। এ নদী এখন মুমূর্ষু অবস্থায়। শিবসার সাথে যুক্ত আর একটি শাখা কয়রা নদী নামে আমাদিতে কপোতাক্ষের সাথে যুক্ত হয়েছে, এ নদী এখনও কিছুটা নাব্যতা আছে। অন্যদিকে খোলপেটুয়া নদীও কপোতাক্ষের সাথে মিলিত হয়েছে।

বিচ্ছিন্ন অংশের শুরু রাড়ুলী থেকে নদীটা বাঁকযুক্ত হয়ে ঘুরে কাটাখালী খেয়াঘাটে এসে পড়েছে। এই অংশটুকু (১৬ কি.মি)) এখন মৃত। মৃত অংশের বড়ো ধরণের সমস্যা হলো জলাবদ্ধতা। স্থানীয় জনগণের অভিমত অনুযায়ী এই অংশে নদী দ্রুত মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার মূল কারণ হলো শালিখায় নির্মিত ১৫ ভেন্টের স্লুইজ গেট। শালিখা নদী কপোতাক্ষের অন্যতম উপনদী, বিনেরপোতার বেতনা থেকে এ নদী কপোতাক্ষে এসে মিশেছে। পোল্ডার ব্যবস্থার আওতায় শালিখার সংযোগমুখে স্লুইজগেট নির্মাণ করার কারণে নিম্নে কপোতাক্ষের মৃত্যু ত্বরান্বিত হয় এবং মূল অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

সমুদ্রের জোয়ার এখন ক্ষীণধারায় কাটাখালী পর্যন্ত পৌঁছায়। কাটাখালী থেকে চাঁদখালির কিছু দূর ভাটি পর্যন্ত ১৫ কি.মি. নদী এখন মুমূর্ষু অবস্থায়, আগামী ২/৩ বৎসরের মধ্যে কয়রা নদীর সংযোগ স্থল আমাদি পর্যন্ত কপোতাক্ষ নদ মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হবে।

৪.২ কপোতাক্ষের উপরের অংশ: ভৈরব নদী (তাহিরপুর থেকে দর্শনা পর্যন্ত)

ভৈবর ও কপোতাক্ষের সঙ্গমস্থল চৌগাছার তাহিরপুর থেকে দর্শনার সীমান্ত চেকপোস্ট পর্যন্ত উজান অংশ সরকারী রেকর্ডপত্র অনুযায়ী ভৈবর নদী যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১১০ কি.মি। এই অংশ ঝিনাইদহ জেলার কোটচাঁদপুর, মহেশপুর উপজেলা এবং চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর ও চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার অর্ন্তগত। আনুমানিক এলাকার কম বেশী আয়তন হবে ৪৭০৭৪হেঃ, ইউনিয়ন সংখ্যা ১৪ টি এবং নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী ৪৫৩৩৮৪ জন ।

তাহিরপুর থেকে দর্শনা পর্যন্ত: ভৈরব অববাহিকা

জেলা	*উপজেলা*	*ইউনিয়ন/ পৌরসভা*	*ক্যাচমেন্ট ভূক্ত এলাকা (হেঃ)*	*ক্যাচমেন্ট ভূক্ত গ্রাম সংখ্যা*	*নির্ভরশীল জনসংখ্যা*
চুয়াডাঙ্গা	চুয়াডাঙ্গা সদর	তিতুদহ	৪৬৭৩	২৯	৩৭৩১২
		বেগমপুর	৫৮১৬	২০	৩৯২৩৪
	মোট	*২টি*	*১০৪৮৯*	*৪৯*	*৭৬৫৪৬*
	দামুড়হুদা	দর্শনা (পৌরসভা)	২৪০১	৯	৩৮৫৬৮
	মোট	*১টি*	*২৪০১*	*৯*	*৩৮৫৬৮*
	জীবননগর	জীবননগর (পৌরসভা)	১৫৭৫	৯	৩৪৬৬৭
		আন্দুল বাড়ীয়া	৩৬১০	৯	২৮২৮৭
		বাঁকা	৬৩৮৪	৩৪	৪৮৩২১
		উথলী	৫৫১০	১৯	৫২২৫৮
	মোট	*৪টি*	*১৭০৭৯*	*৭৫*	*১৬৩৫৩৩*
জেলা মোট	*৩টি*	*৭টি*	*২৯৯৬৯*	*১৩৩*	*২৭৮৬৪৭*
ঝিনাইদহ	কোটচাঁদপুর	কোটচাঁদপুর (পৌরসভা)	১৭৮৫	৯	৩৮৯৩০
		বলুহর	২৭০০	১১	২১৮৭৭
		এলাঙ্গী	২৫৬৬	১৫	১৯৬৩৮
	মোট	*৩টি*	*৭০৫১*	*৩৫*	*৮০৪৪৫*
	মহেশপুর	মহেশপুর (পৌরসভা)	২১৩৫	৯	৩৪৫৬৫
		এস.কে.বি	২২৮৩	১১	১৭১৫৫
		ফতেপুর	২৯৯৭	১১	২৩৮৮৫
		আজমপুর	২৬৩৯	১১	১৮৬৮৭
	মোট	*৪টি*	*১০০৫৪*	*৪২*	*৯৪২৯২*
জেলা মোট	*২টি*	*৭টি*	*১৭১০৫*	*৭৭*	*১৭৪৭৩৭*
সর্বমোট	*৫টি উপজেলা*	*ইউনিয়ন ১৪ টি*	*৪৭০৭৪*	*২১০*	*৪৫৩৩৮৪*

ভৈবর নদী পূর্বে মাথাভাঙ্গার সাথে যুক্ত ছিল। সুবলপুর থেকে মাথাভাঙ্গা ও ভৈরবের যুক্ত প্রবাহ মাথাভাঙ্গা নামে দর্শনায় এসে বাঁক নিতে শুরু করে। দর্শনা থেকে ২০-২৫ কি.মি. এই বাঁক ঘুরে আবার দর্শনার অনতিদূরে সীমান্ত চেক পোস্টের পাশ দিয়ে ভারত অভিমুখে রওনা হয়। ১৮১৯/২০ সালে সংযোগ খাল কেটে এই বাঁক সোজা করা হয়। বাঁক যুক্ত অংশের প্রথম ও শেষ ভাগ কালক্রমে পলি জমে ভরাট হয় এবং মধ্যবর্তী অংশ পরিণত হয় বাওড়ে। বাওড়ের নাম সিংহনগর বাওড়। এই সিংহনগর বাওড়ের বাঁক থেকে ভৈরব নদী মাথাভাঙ্গা থেকে বিমুক্ত হয়েছে বা উৎপত্তি লাভ করেছে। উৎপত্তি স্থলের দক্ষিণে জীবন নগরের সিংহনগর গ্রাম এবং উত্তরে চুয়াডাঙ্গা সদরের রিঙ্গেরপোতা গ্রাম। ভৈরবের দর্শনা শহরমুখী সংযোগ এখন পরিত্যক্ত, সংযোগ আছে দর্শনার সীমান্ত চেক পোস্টের নদীখাতের সাথে।

সীমান্ত চেকপোস্ট থেকে নিমতলার সীমান্ত ফাঁড়ি পর্যন্ত ৪ কি.মি নদীখাত ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকা। চেক পোস্টের নদীর উপর নির্মিত ব্রীজ এখন ভারত সরকারের দখলে। ব্রীজের উভয় পাশে লোহার বেড়া দেওয়া যার মধ্য দিয়ে পানি নিষ্কাশিত হওয়া খুবই কঠিন। এলাকার মানুষদের বক্তব্য অনুযায়ী ২০০৪ সালে পানির উচ্চতা সর্বোচ্চ বৃদ্ধি পেয়ে মাথাভাঙ্গা থেকে বন্যার পানি রেলব্রীজের মধ্যে প্রবেশ করে। এলাকার মানুষ মনে করে ব্রীজের আগে পিছে নদীখাত গভীর করা গেলে পানি প্রবেশের পরিমাণ ও নিষ্কাশিত হওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে।

চেকপোস্ট থেকে নিমতলা সীমান্ত ফাঁড়ি পর্যন্ত নদীখাত পলি জমে ফসল চাষাবাদের উপযোগী সমতল ভূমিতে পরিণত হয়েছে। নদীখাতের মাঝ বরাবর সীমানা করে ভারত ও বাংলাদেশের মানুষ এই ভরাট হওয়া খাতে চাষাবাদ করে থাকে। সরেজমিনে দেখা গেছে ভরাট হওয়া সমতল ভূমিতে আখচাষ, কলাচাষ, খেসারী-ধান প্রভৃতি চাষাবাদ হচ্ছে। জমিতে কিছু কিছু গাছ-গাছালীও জন্মেছে। এর পরেই সিংহনগর বাওড়। বাওড় মাছ চাষের জন্য সরকার থেকে লীজ দেওয়া। বাওড়ের মুখে কয়েকটি পুকুর করা হয়েছে যার দরুণ এলাকার পানি নিষ্কাশনে মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে বলে এলাকাবাসী জানান।

ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত অতিক্রম করে ভৈরব বাংলাদেশের চুয়াডাঙ্গা ও জীবননগর উপজেলার সীমানা চিহ্নিত করে ঝিনাইদহ-যশোর জেলা অভিমুখে রওনা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা জেলার মধ্যে জীবননগরের লক্ষীপুর ব্রীজের আগে পিছে এবং অন্যান্য আরও ২/১ জায়গায় সারা বৎসর নদীতে পানি থাকে। চৈত্র বৈশাখ মাসে নদীতে পানি থাকার পরিমান স্থান বিশেষ ১-৩ ফুট। নদীর অবশিষ্ট অংশ এ সময় শুকিয়ে যায় এবং নদীর বুক জুড়ে ধান চাষাবাদ করা হয়ে থাকে। ভৈরবের উৎপত্তিস্থল সিংহনগরের কিছু ভাটিতে লীজ নিয়ে নদী ঘিরে পুকুর করা হয়েছে। ফলে ঐ এলাকার পানি নিষ্কাশনের খুবই অসুবিধা হচ্ছে বলে এলাকাবাসী জানিয়েছে।

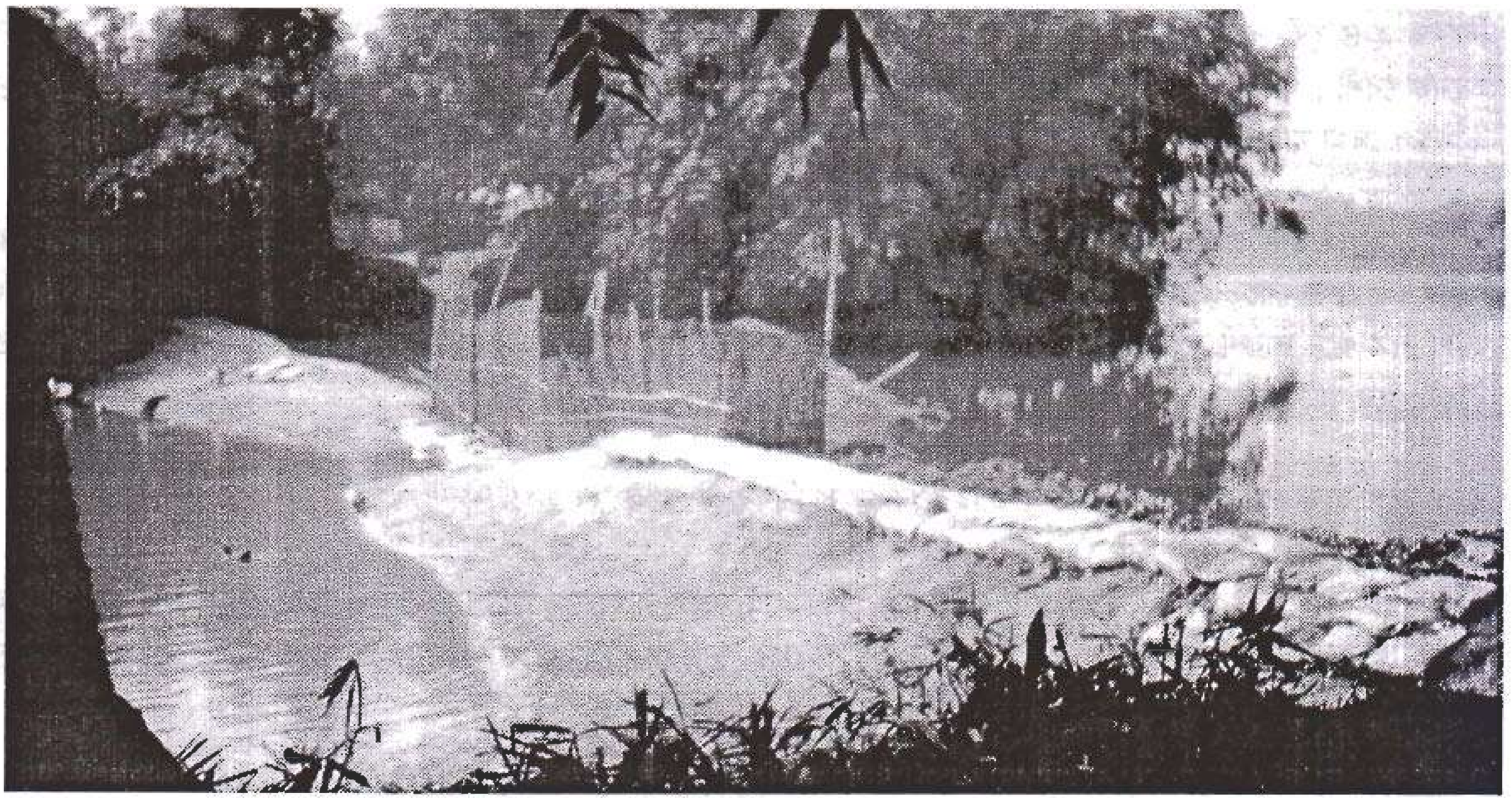

ভৈরব নদীর উৎপত্তি স্থলের মুখে পাটা স্থাপন ও মাটির বাঁধ নির্মাণ।

যে সব এলাকায় নদীর বুক উঁচু হয়ে পড়েছে সে সব এলাকায় শুকনো মৌসুমে ধান চাষ করা হয়। বর্ষাকালে বর্ষার পানি এইসব এলাকার সংযোগ খালের মাধ্যমে বিলে এবং জনপদে ঢুকে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে, এমনকি কিছু এলাকায় বন্যার কারণে রাস্তাঘাট ডুবে যায়, বাড়ী-ঘরে পানি উঠে। বন্যা বা জলাবদ্ধতার মেয়াদ থাকে স্থান বিশেষ এক সপ্তাহ থেকে শুরু করে একমাস পর্যন্ত। তবে বন্যার পানি নেমে গেলেও নদী উঁচু হওয়ার কারণে অনেক নীচু বিলের পানি নিষ্কাশিত হতে পারে না। উল্লেখ্য যে ২০০০ সালের ভয়াবহ বন্যার আতংক এখনও মানুষদের মধ্যে বিরাজ করছে। এ বন্যা অত্র এলাকার জন্য একটি যুগান্তকারী ঘটনা। মানুষ মনে করে নিকট ভবিষ্যতেও এ ধরণের আরো বন্যা সংঘঠিত হবে। সেই জন্য নদী খনন একান্তই প্রয়োজন।

পূর্বেই বলা হয়েছে ঝিনাইদহ জেলার মধ্যে ভৈরব নদীকে এলাকার মানুষ কপোতাক্ষ নদী বলে। এই এলাকাতেও বর্ষাকালে খাল নালার মাধ্যমে বর্ষার পানি বিলে এবং জনপদে ঢুকে পড়ে। গত বছর অনেক এলাকার রাস্তাঘাট, ফসলীক্ষেত এবং বাড়ীঘর প্লাবিত হয়েছে। শুকনো মৌসুমেও অনেক এলাকা জলাবদ্ধ থাকে। চৈত্র বৈশাখ মাসে স্থান বিশেষ ২-৪ ফুট পানি থাকে। এই অংশে মহেশপুর ও কোটচাঁদপুর এলাকায় নদীতে পাটা ও কোমর দেওয়ার পরিমাণ অনেক বেশী। পাটা ও কোমর দেওয়া এলাকায় পলি জমে নদী ভরাট হচ্ছে। ফলে একই এলাকার নদীর সমতলে বিভিন্ন ভূমিরূপ দেখা যাচ্ছে।

যে সব এলাকায় নদীর বুক উঁচু হয়ে পড়েছে সে সব এলাকায় শুকনো মৌসুমে ধান চাষ করা হয়। বর্ষাকালে বর্ষার পানি এইসব এলাকার সংযোগ খালের মাধ্যমে বিলে এবং জনপদে ঢুকে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি করে, এমনকি কিছু এলাকায় বন্যার কারণে রাস্তাঘাট ডুবে যায়, বাড়ী-ঘরে পানি উঠে। বন্যা বা জলাবদ্ধতার মেয়াদ থাকে স্থান বিশেষ এক সপ্তাহ থেকে শুরু করে একমাস পর্যন্ত। তবে বন্যার পানি নেমে গেলেও নদী উঁচু হওয়ার কারণে অনেক নীচু বিলের পানি নিষ্কাশিত হতে পারেনা। উল্লেখ্য যে ২০০০ সালের ভয়াবহ বন্যার আতংক এখনও মানুষদের মধ্যে বিরাজ করছে। এ বন্যা অত্র এলাকার জন্য একটি যুগান্তকারী ঘটনা। মানুষ মনে করে নিকট ভবিষ্যতেও এ ধরণের আরো বন্যা সংঘঠিত হবে। সেই জন্য নদী খনন একান্তই প্রয়োজন।

পূর্বেই বলা হয়েছে ঝিনাইদহ জেলার মধ্যে ভৈরব নদীকে এলাকার মানুষ কপোতাক্ষ নদী বলে। এই এলাকাতেও বর্ষাকালে খাল নালার মাধ্যমে বর্ষার পানি বিলে এবং জনপদে ঢুকে পড়ে। গত বছর অনেক এলাকার রাস্তাঘাট, ফসলীক্ষেত এবং বাড়ীঘর প্লাবিত হয়েছে। শুকনো মৌসুমেও অনেক এলাকা জলাবদ্ধ থাকে। চৈত্র বৈশাখ মাসে স্থান বিশেষ ২-৪ ফুট পানি থাকে। এই অংশে মহেশপুর ও কোটচাঁদপুর এলাকায় নদীতে পাটা ও কোমর দেওয়ার পরিমাণ অনেক বেশী। পাটা ও কোমর দেওয়া এলাকায় পলি জমে নদী ভরাট হচ্ছে। ফলে একই এলাকার নদীর সমতলে বিভিন্ন ভূমিরূপ দেখা যাচ্ছে।

নদীতে কচুরিপানা জন্মানোর পরিমাণ অত্যধিক। এলাকার মানুষের বক্তব্য সামান্য বর্ষাপেলে এবং গরমের আবহাওয়ায় কচুরিপনা দ্রুত বেড়ে উঠে এবং নদীজুড়ে কচুরিপানার ধাপ তৈরী হয়, তখন নৌকা চলাচল করা কঠিন হয়ে পড়ে এবং পানি নিষ্কাশনে দারুণ সমস্যার সৃষ্টি হয়। এই সব কচুরিপানা ভেসে এসে নিম্ন অববাহিকার পাটা-কোমরে ব্রীজ-সাঁকোতে বাঁধা পেয়ে আট্‌কে পড়ে এবং পানি প্রবাহে বাঁধা সৃষ্টি করে।

৪.৩ কপোতাক্ষ নদের মধ্যবর্তী অংশঃ তাহিরপুর থেকে শিববাড়ী পর্যন্ত

পাইকগাছা উপজেলার শিববাড়ী থেকে চৌগাছার তাহিরপুর পর্যন্ত বর্তমানে সরকারী রেকর্ডপত্রে কপোতাক্ষ নদ হিসাবে ধরা হচ্ছে যার দূরত্ব প্রায় ১৭৫ কি.মি। আমরা এ অংশের বন্যা, জলাবদ্ধতা ও সমস্যার উপর একটি জরীপ কার্য সম্পন্ন করেছি।

কপোতাক্ষ ক্যাচমেন্ট জরীপ

(তাহিরপুর থেকে পাইকগাছার শিববাটী পর্যন্ত)

জেলা	*উপজেলা*	*ইউনিয়ন/ পৌরসভা*	*ক্যাচমেন্ট ভূক্ত এলাকা (হেঃ)*	*ক্যাচমেন্ট ভূক্ত গ্রাম সংখ্যা*	*জলাবদ্ধ গ্রাম সংখ্যা*	*জলাবদ্ধতার আয়তন (হেঃ)*	*নির্ভরশীল জনসংখ্যা*
ঝিনাইদহ	মহেশপুর	আজমপুর	৪৫৩	৩	৩	৩০৪	৪১৪৭
		মান্দার বাড়ীয়া	২৮৯৩	২০	২০	১২০৯	২৭৯৩৮
		নাটিমা	৫২	১	১	৫	১১৫৬
জেলা মোট	*মোট ১টি*	*৩টি*	*৩৩৯৮*	*২৪*	*২৪*	*১৫১৮*	*৩৩২৪১*
চৌগাছা	চৌগাছা	হাকিমপুর	২৮৯৮	১০	৮	১০১৮	১৩০৬৪
		নারায়ণপুর	৩৩১২	১৩	১৩	১৪২৭	২০০২৮
		স্বরুপদহা	৩৬০২	২৯	২২	৯৬৮	২৯৪৭০
		চৌগাছা পৌরসভা	১৩৫১	৭	৭	৬৫২	১৬৭৯৩
		ধূলিয়ানী	১৪৫৬	১১	১১	৫৭৬	১৫৩৭৪
		পাতিবিলা	১৭৩৬	১০	৮	৭৬০	১৩৭৬২
		পাশাপোল	২৫৯৭	১৭	১৭	১৭৪০	২০৯৩৫
		সিংহঝুলি	১৩৯০	৯	৯	৫৪৪	১৪৯৪৩
		ফুলসরা	২৬৬৭	১৬	৮	৭০৬	২৪৭২২
মোট	*৯টি*		*২১০০৫*	*১২২*	*১০৩*	*৮৩৯১*	*১৬৯০৯১*
যশোর সদর	দিয়াড়া		২৮১২	১৬	১৬	১৬০০	৩৭৩৩২
মোট	*১টি*		*২৮১২*	*১৬*	*১৬*	*১৬০০*	*৩৭৩৩২*
যশোর	ঝিকরগাছা	গঙ্গানন্দপুর	১৯৮৮	১০	৯	৮৩৫	১৯০৪৭
		মাগুরা	৩০৪১	১৭	১৭	১৫১১	২৭৭৬৯
		সিমুলিয়া	২০২	৩	৩	৫৫	১৮৭৮
		ঝিকরগাছা পৌরঃ	১৩১৯	৭	৪	৬১৭	৩৭২৬৬
		গদখালী	১৭৪৫	১০	৯	৫২১	২১২৮৭
		ঝিকরগাছা	১৯১৯	১২	১০	৫৪৪	২৫৮৭৭
		পানিসরা	২৩৩৮	১৫	১৩	১১০২	২৮৪১২
		নির্বাস খোলা	১৪৭৭	৯	৭	৬২০	১৫১৪৫
		হাজিরবাগ	৭৬০	৫	৫	২০৫	৭০২৫
		বাঁকড়া	২৬৩৩	১১	৭	১৪৫১	২৬৩২৮
	মোট	*১০টি*	*১৭৪২২*	*৯৯*	*৮৪*	*৭৪৬১*	*২১০০৩৪*
	মনিরামপুর	রুহিতা	৩৬৪	৪	৪	১৮৬	৪০৬৮
		হরিহরনগর	৩১১৭	২০	২০	১৭৭৩	২৭৫৩৪
		খেদাপাড়া	১৯৯১	৮	৬	৩৬৫	১৭০০৩
		ঝাঁপা	১৮৮৮	৫	৫	১১৭৩	১৯৫৯১
		মশ্মিনগর	২৮১৩	১২	১২	১৩৭৫	৩০৭৮০
		চালুয়াহাটী	১৫৪০	১০	৯	৫৯০	১৬৫৪৩
	মোট	*৬টি*	*১১৭১৩*	*৫৯*	*৫৬*	*৫৪৬২*	*১১৫৫০৯*
	কেশবপুর	ত্রিমোহিনী	১৮১৭	১১	১০	৭৬৩	২৫৩৭২
		সাগরদাঁড়ী	২৯২০	১৭	১৭	১৩১৪	৩১৮৯০
		বিদ্যানন্দকাটি	৯৮৮	১২	১০	৭০৮	১০৬২৭
	মোট	*৩টি*	*৫৭২৫*	*৪০*	*৩৭*	*২৭৮৫*	*৬৭৮৮৯*

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন/ পৌরসভা	ক্যাচমেন্ট ভূক্ত এলাকা (হেঃ)	ক্যাচমেন্ট ভূক্ত গ্রাম সংখ্যা	জলাবদ্ধতা গ্রাম সংখ্যা	জলাবদ্ধতার আয়তন (হেঃ)	নির্ভরশীল জনসংখ্যা
সাতক্ষীরা	কলারোয়া	দেয়াড়া	১৭১৪	৫	৩	৭৭১	১৯৫৮১
		যুগীখালী	১৮০৭	১২	১০	৭৯৫	১৪৬৩৩
		জয়নগর	১৬৪৪	১১	১১	৯৯৫	১৫৭৯৬
		জালালাবাদ	৯২৮	৭	৬	৬৮৭	১৩৯৩৭
	মোট	*৪টি*	৬০৯৩	৩৫	৩০	৩২৪৮	৬৩৯৪৭
	তালা	ধানদিয়া	১৪৮৬	৯	৯	৯৯৯	১৬০২২
		সরুলিয়া	১২৮০	১৩	১৩	৬৪৬	২১৮১৮
		কুমিরা	১৮৫৭	১৫	১৫	১২০৭	২২৪৫৭
		তেঁতুলিয়া	১৪৪৬	১০	১০	৬৯৪	১৪৯৯৪
		ইসলামকাটি	১২৯৫	১৭	১৬	৮১৩	২০৩৮৩
		খলিষখালী	৮৮১	৭	৭	১৩৮	৯৬০১
		মাগুরা	২৬৩৯	১৪	১০	৩৬৬	২২০১৬
		তালা	৮৮৫	১২	১২	৬১৯	১৩৭৫০
		খলিলনগর	১৩৮৯	৬	৬	৭৪০	১৪০১২
		জালালপুর	২৪৩০	১৩	৭	১৩১	২৪৬২৬
		খেশরা	১০৬৭	৭	৫	২৯৯	৩৯৫৪
	মোট	*১১টি*	১৬৬৫৫	১২৩	১১০	৬৬৫২	১৮৩৬৩৩
জেলা মোট	*২টি*	*১৫টি*	২২৭৪৮	১৫৮	১৪০	৯৯০০	২৪৭৫৮০
খুলনা	পাইকগাছা	কপিলমুনি	৪৫২	৪	=	=	৭৬৫৫
		হরিঢালী	১০৮২	১২	৫	১০৩	১৫৫৬৭
		গদাইপুর	৭২৭	৬	=	=	৯৬২১
		রাড়ুলী	১০০৪	৫	৫	৮০০	১৩৭৭
		পাইকগাছা পৌর সভা	৬৪৪৭	৪	=	=	১৪৫৫১
		চাঁদখালী	২০৯	০০২	=	=	৫০০৩
	মোট	*৬টি*	৯৯২১	২৯	১০	৯০৩	৬৬৬৭৩
জেলা মোট	১টি	৬টি	৯৯২১	২৯	১০	৯০৩	৬৬৬৭৩
সর্বমোট ৪ ৪টি	*৯টি*	*৫৩টি*	৯৪৭৪৪	৫৪৭	৪৭০	৩৮০২০	৯৪৭৩৪৯

সুন্দরবন থেকে দর্শনা পর্যন্ত কপোতাক্ষ ক্যাচমেন্ট

ক্যাচমেন্ট অংশ	*দৈর্ঘ্য (কি. মি)*	*জেলা*	*উপজেলা*	*ইউনিয়ন সংখ্যা*	*গ্রাম সংখ্যা*	*ক্যাচমেন্টের আয়তন*	*নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী*
দর্শনা থেকে তাহিরপুর উপরের অংশ: ভৈরব অববাহিকা	১১০	চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ	চুয়াডাঙ্গা সদর, দামুড়হুদা, জীবন নগর, কোটচাঁদপুর, মহেশপুর	১৪	২১০	৪৭০৭৪	৪৫৩৩৮৪
তাহিরপুর থেকে পাইকগাছার শিববাড়ী। বর্তমান কপোতাক্ষ	১৭৫	যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা ও ঝিনাইদহ	মহেশপুর, চৌগাছা, ঝিকরগাছা, যশোর সদর, মনিরামপুর, কেশবপুর, তালা, ও পাইকগাছা	৫৩	৫৪৭	৯৪৭৪৪	৯৪৭৩৪৯
রাড়ুলী থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত। কপোতাক্ষের বিচ্ছিন্ন অংশ	৮২	খুলনা ও সাতক্ষীরা	পাইকগাছা, কয়রা, আশাশুনি ও শ্যামনগর	১৫	৪২৮	৭৪১০৮	৫৮৪৮৮২
সর্বমোট	৩৬৭	৫	১৫	৮২	১১৮৫	২১৫৯২৬	১৯৮৫৬১৫

৫. ২০০০ সালের বন্যা

২০০০ সালে কপোতাক্ষ অববাহিকায় স্মরণকালের বন্যা সংঘঠিত হয়। এ সময় সীমান্তের উপরের পশ্চিমবঙ্গের পানি এসে পোল্ডারের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং সৃষ্টি করে অবর্নণীয় এক অসহনীয় পরিবেশ। উল্লেখ্য যে পোল্ডার ব্যবস্থার কারণে প্রতিবছর নদীতে স্বাভাবিকভাবে পলি জমে নদীর বুক উঁচু হচ্ছে। এ কারণ ছাড়াও বিশেষ কিছু কারণে নদীর বুক উঁচু হয়ে ২০০০ সালের বন্যা পরিস্থিতি মারাত্মক আকারে আবির্ভূত হয়। সে কারণগুলো হলো:

১৯৯৪ সালে সরসকাটি ব্রীজ এবং ১৯৯৭ সালে কপিলমুনিতে ব্রীজ নির্মাণ। নদীকে অপ্রশস্ত করে নদীর বাঁকে নদীর মধ্যে পিলারগুচ্ছ দিয়ে এ ব্রীজগুলো নির্মাণ করা হয়েছে।
নদী খননের জন্য ১৯৯৯ সালে সরসকাটিতে নদীর বুকে একটি মাটির বাঁধ নির্মাণ করা হয় যা ঠিকমতো আর অপসারণ করা হয়নি।
কপোতাক্ষের জেগে উঠা চরগুলো বেদখল এবং নদীর মধ্যে মাছ ধরার যন্ত্রপাতি স্থাপন প্রভৃতি।

এসব অপরিকল্পিত কার্যক্রমের দরুণ সরসকাটির উজান এবং ভাটিতে দ্রুতহারে পলি অবক্ষেপিত হয়ে অতি দ্রুততার সাথে নদী বক্ষ উঁচু হয়ে পড়ে যার পরিপ্রেক্ষিতে জলাবদ্ধতার বিস্তৃতি ব্যাপক এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং দেখা দেয় বন্যা।

৬. ২০০৮ সালের বন্যা ও জলাবদ্ধতা

বিগত শতাব্দীর ৯০ দশকের শুরুতে কপোতাক্ষ অববাহিকায় জলাবদ্ধতা সমস্যা স্পষ্ট হয়ে উঠে, তবে তা ছিল সহনশীল পর্যায়ে। মূলতঃ ২০০০ সাল থেকে জলাবদ্ধতা ও বন্যা সমস্যা নিয়মিত হয়ে দাঁড়ায়। এ সমস্যা দূর করার জন্য সরকার বা বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তাতে সমস্যার সাময়িক উপশম ঘটে বটে কিন্তু পরিনামে সমস্যার তীব্রতা ও জটিলতা আরো বৃদ্ধি পায়। ২০০১-০২ অর্থ বৎসর থেকে ২০০৪-০৫ অর্থ বৎসর পর্যন্ত পানি উন্নয়ন বোর্ড প্রায় ২৯ কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে বাস্তবায়ন করে বিভিন্ন কর্মসূচী যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ড্রেজার মেশিন দিয়ে নদী খনন ও ক্রসড্যাম (নদীর বুকে মাটির বাঁধ) দিয়ে ম্যানুয়ালী (মানুষ দ্বারা) নদী খনন।

ক্রসড্যাম এবং ড্রেজার মেশিন উভয় ক্ষেত্রে দেখা গেছে এর পশ্চাতে বা ভাটিতে জোয়ারের গতিবেগ দারুণভাবে বাঁধাগ্রস্থ হচ্ছে এবং দ্রুতহারে নদীর বুকে পলি জমে নদীবক্ষ উঁচু হয়ে পড়ছে। বিগত ৩ বৎসর যাবৎ এভাবে অব্যাহত পলি জমে কেশবপুর উপজেলার সুড়িঘাটা থেকে পাইকগাছা কপিলমুনির ভাটিতে জেঠুয়া বিল পর্যন্ত প্রায় ৩০ কি.মি. নদীর বক্ষদেশ উঁচু হয়ে পড়ে। নদী ব্যবস্থার ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে এটি একটি অস্বাভাবিক অবস্থা। কেননা এতে উজান ও ভাটি উভয় অংশ নীচু, মাঝখানে মধ্যবর্তী অংশ উটের পিঠের মতো উঁচু হয়ে গিয়েছে। এই উঁচু অংশ অতিক্রম করে না পারছে জোয়ারের পানি উপরে উঠতে, না পারছে বর্ষার পানি নীচে নামতে। ফলে জোয়ার এলাকায় দেখা দিচ্ছে ভাঙ্গন আর প্লাবন, আর উজান এলাকার নদীর দু'কূল অতিক্রম করে জনবসতি জনপদে দেখা দিচ্ছে ভয়ংকর বন্যা।

জরীপ করে দেখা গেছে মহেশপুর উপজেলার খালিশপুর থেকে তালা উপজেলার খলিলনগর ইউনিয়নের ঘোষনগর পর্যন্ত প্রায় ১৯০ কি.মি নদী তীরবর্তী এলাকা প্লাবিত হয়েছে। এর মধ্যে ঘোষনগর থেকে চৌগাছার তাহিরপুর পর্যন্ত বন্যার তীব্রতা অপেক্ষাকৃত অনেক বেশী।

পানি কমিটির উদ্যোগে এবং সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ সমূহের সহায়তায় ত্বরিত একটি জরীপ কার্য সম্পাদন করা হয়। জরীপ কাজে সরকারী পরিসংখ্যান ও ক্ষয়ক্ষতির বিবরণীমূলক তথ্যের সহাযোগিতা গ্রহণ করা হয়েছে। উপস্থিত বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষদের নিয়ে স্পট মিটিং এর ভিত্তিতে, এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করে এবং আমাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এ রিপোর্টটি প্রনয়ণ করা হয়। আমাদের ধারণা সংগৃহীত তথ্যের ক্ষেত্রে ২/৪টি গ্রাম, ক্যাচমেন্ট এলাকা ও জলাবদ্ধতা প্রভৃতি বিষয়ে সামান্য হেরফের ঘটতে পারে তাতে, পরিস্থিতির সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনা করতে তেমন কোন সমস্যার সৃষ্টি হবেনা।

তালা থেকে ঝিকরগাছা পর্যন্ত ৯২ কি.মি জরীপ করে দেখা গেছে নদীর দু'কূল প্লাবিত হয়েছে ৬০টি স্থানে (সংযুক্তি তালিকা-১)। তীব্র না হলেও ঝিকরগাছার উপরেও নদীতীর উপচিয়েছে যা জরীপ করা সম্ভব হয়নি। অববাহিকার মধ্যে ২০৯ টি গ্রাম বন্যা দ্বারা প্লাাবিত। বিভিন্ন আশ্রয় কেন্দ্রে কমপক্ষে ৩ মাস যাবৎ আশ্রয় নিয়েছে ৫০ হাজারের অধিক মানুষ। বন্যা মোকাবেলার জন্য ইতিমধ্যে এলাকার মানুষ বসতভিটা, টিউবওয়েল, ল্যাট্রিন, এবং মৎস্য ঘেরের বাঁধ উঁচু করেছিল, প্লাবিত সড়ক-মহাসড়কগুলোও সরকার থেকে উঁচু করা হয়েছিল। এলাকার মানুষ ভাবতেই পারেনি স্বল্প বৃষ্টিপাতে এগুলোও বন্যা দ্বারা প্লাবিত হবে। মানুষ মনে করছে তাদের ভাগ্য কিছুটা ভালো যে এ বছর বৃষ্টিপাতের পরিমান বেশী হয়নি।

২০০৩ সালে এলাকা কি পরিমান জলাবদ্ধ কবলিত ছিল তার একটি পরিসংখ্যান রয়েছে CEGIS প্রণীত রিপোর্টে। তাতে দেখা যাচ্ছে যশোর জেলার ঝিকরগাছা, মনিরামপুর ও কেশবপুর উপজেলা এবং সাতক্ষীরা জেলার তালা ও কলারোয়া উপজেলায় জলাবদ্ধতার পরিমাণ ১২,৬৮৭ হেঃ, ক্ষতিগ্রস্থ ইউনিয়ন ১৬, গ্রাম সংখ্যা ৭৭টি এবং ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী ১,১৫,২০০। সেই তুলনায় ২০০৮ সালে ক্ষতিগ্রস্থ জেলা ৪টি, উপজেলা ৯টি. জলাবদ্ধতার পরিমাণ ৩৮০২০হেঃ, জলাবদ্ধ গ্রাম সংখ্যা ৪৭০ টি এবং ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ৯৪৭৩৪৯ জন।

২০০৩ ও ২০০৮ সালের ক্ষয়ক্ষতির তুলনামূলক চিত্র

ক্ষয়ক্ষতি	২০০৩	২০০৮
জেলা	যশোর ও সাতক্ষীরা	যশোর, সাতক্ষীরা, খুলনা ও ঝিনাইদহ
উপজেলা	ঝিকরগাছা, মনিরামপুর, কেশবপুর, কলারোয়া ও তালা =৫টি	ঝিকরগাছা, মনিরামপুর, কেশবপুর, তালা, পাইকগাছা, চৌগাছা, মহেশপুর ও কোটচাঁদপুর= ৮টি
ইউনিয়ন	১৬টি	৬০টি
গ্রাম সংখ্যা	৭৭টি	৪৭০টি
জলাবদ্ধতার পরিমাণ	১২৬৮৭ হেঃ	৩৮০২০ হেঃ
ক্ষতিগ্রস্থ জনগোষ্ঠী	১১৫২০০	৯৪৭৩৪৯

উল্লেখ্য যে ২০০০ সালের বৃষ্টিপাতের তুলনায় ২০০৭ সালে বৃষ্টিপাত হয়েছে ২০ ভাগ কম, ২০০৮ সালে কমের পরিমান ৩৫ ভাগ। বিগত ২ বৎসর এলাকায় দেখা দিয়েছে লম্বা খরা। এলাকার কোন প্রবীণ লোকও এ ধরণের খরা অতীতে কখনও দেখে নাই। একদিকে বন্যা ও জলাবদ্ধতা দ্বারা মানুষ দিশেহারা অন্যদিকে মানুষ পড়েছে খরার কবলে। প্রচন্ড খরার দরুণ মাটি ফেটে চৌচির, পাম্পমেশিন দিয়ে সেচছাড়া বীজতলা তৈরী করা সম্ভব হচ্ছেনা, ফসলী জমিতে প্রয়োগ করতে হচ্ছে অতিরিক্ত সার। এ ধরনের অস্বাভাবিক ও বিশৃংখল অবস্থা দেখা দিয়েছে বিগত ২বৎসর যাবৎ।

৭. ভাঙ্গন ও জোয়ারের প্লাবন

১৫/১৬ বৎসর পূর্ব থেকেই কপোতাক্ষ নদীতে প্রতিবছর বান আসা অব্যাহত থাকে। তখন থেকেই এলাকার মানুষ বুঝতে পারে যে অচিরেই এ নদী মৃত্যু মুখে পতিত হবে। পূর্বে নদীতে শুশুক (স্থানীয় ভাষায় শোস) দেখা যেতো। ২/৩ বৎসর পূর্বেও পাটকেলঘাটা থেকে তালা বাজার পর্যন্ত (১৪ কি.মি) জোয়ারের ভাঙ্গন ও প্লাবন অব্যাহত ছিল। পাটকেলঘাটা বাজার, ইসলামকাটি বাজার, মাগুরা বাজার ও তালা বাজারে ভরাগোনে (তেজকটাল) জোয়ার দ্বারা প্লাবিত হতো, বিভিন্ন বাঁকের চরার অপর পাড়ে ভাঙ্গন দেখা দিতো। কিন্তু এখন এ এলাকায় জোয়ার আর তেমন উঠতে পারেনা। তালা-মাগুরা এলাকায় জোয়ার মাত্র ঘন্টাখানিক সময় স্থায়ী হয় যার পানি প্রবাহের গতিবেগ খুবই ক্ষীণ।

বর্তমানে কপিলমুনির কাসিমপুর থেকে প্রায় শিববাড়ীর শিবসা পর্যন্ত (৩৩ কিমি) একদিকে ভাঙ্গন অন্যদিকে প্লাবন অসহনীয় পর্যায়ে চলে গিয়েছে। এলাকাবাসীর অভিমত অনুযায়ী প্রতি বৎসর এর তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নদী যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানেই এ ভাঙ্গন ও প্লাবনগুলো সংঘটিত হচ্ছে। নদীর যে পাড়ে ভূ-গঠন প্রক্রিয়া প্রায় সম্পন্ন হয়ে তীরবর্তী এলাকা উঁচু হয়ে যায় সেখানে গড়ে উঠে শহর-বন্দর-বাজার-গঞ্জ, অপর পাড়ে পলি জমে গড়ে উঠে চরাভূমি। বিগত ৪ বৎসর যাবৎ এ চরাভূমিতে বর্ধিত হারে পলি জমে বাঁকগুলো অপ্রশস্ত হয়ে পড়েছে, ফলে অমাবশ্যা ও পূর্নিমার সময়ে এবং বর্ষাকালে অপ্রশস্ত ও অগভীর নদী জোয়ারের চাপ আর ধারণ করতে পারছেনা। উঁচু পাড়গুলো ভেঙ্গে নদী গর্ভে বিলীন হচ্ছে এবং উভয় পাড়ের তীরবর্তী এলাকায় জোয়ার দ্বারা প্লাবিত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা এর সাথে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিরও সম্পর্ক রয়েছে।

কপোতাক্ষ ঐতিহ্য সমৃদ্ধ একটি সুপ্রাচীন নদী। এর তীরে তীরে প্রাচীন কালে, মোগল পাঠান এবং ইংরেজ আমলে অনেক ঐতিহাসিক কীর্তি ও স্থাপনা গড়ে উঠেছে যা এখন ভাঙ্গনের সম্মুখীন, নদীগর্ভে বিলীন হতে চলেছে। কাছীঘাটা, কপিলমুনি, জেঠুয়া, বালিয়া, আগরদাঁড়ি, বোয়ালিয়া প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধ বাজার এখন হুমকীর সম্মুখীন (সংযুক্তি- ২)। ভরাকটাল তেজকটালের সময় এসব বাজারে ১/২ ফুট পানি উঠে প্লাবিত করে। কপিলমুনির কাসিমনগর থেকে বোয়ালিয়া পর্যন্ত নদীর পূর্ব পাড়ে জোয়ারের পানি প্রবেশ রোধে খালের মধ্যে তেমন কোন নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নেই। সংগত কারণে বিশেষ করে ভরাগোনে জোয়ারের পানি ঐসব খালে প্রবেশ করে খালের দু'পাশ উপচিয়ে জনপদ-জনবসতি প্লাবিত করছে, এক্ষেত্রে কপিলমুনির বাজার একটি বড় উদাহরণ। কপিলমুনি বাজারের মধ্যে ৩টি ড্রেনেজ ব্যবস্থা আছে যার একটিতেও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো নাই। ফলে ভরাগোনে জোয়ারের সময় এসব ড্রেনেজ ছাপিয়ে বাজারে পানি উঠে যায়।

ভাঙ্গন রোধে সরকারের তরফ থেকে ইতিমধ্যে কিছু কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন খাঁচা দেওয়া (পার্কো পাইল), ব্লক স্থাপন, প্রতিরক্ষা বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি। কিন্তু সমস্যার তুলনায় এ উদ্যোগ অত্যন্ত সীমিত। স্থানীয় জনগণও চেষ্টা করছে নিজেদের উদ্যোগে নদীতীরে ছোট-খাট অস্থায়ীবাঁধ নির্মাণ এবং বিভিন্ন ধরণের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে, কিন্তু তা দ্বারা শেষরক্ষা সম্ভব হচ্ছেনা। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ প্রয়োজন।

৮. বন্যা, জলাবদ্ধতা ও নদীভাঙ্গনের কারণ

দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় বন্যা, জলাবদ্ধতা ও নদীভাঙ্গন এখন সাধারণ ঘটনা। এ ঘটনার প্রধান অপ্রধান সহ বহুমাত্রিক কারণ এর সাথে সংশ্লিষ্ট যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারণগুলো হলো:

পোল্ডার ব্যবস্থা ও পলি সমস্যা।
ভূমির নিম্নগমন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি।
মাথাভাঙ্গা প্রবাহ থেকে এলাকার বিচ্ছিন্নতা।
নদী-খাল বেদখল হওয়া এবং নিষ্কাশন পথে বিভিন্ন রকম প্রতিবন্ধকতা।

৮.১ পোল্ডার ব্যবস্থা ও পলি সমস্যা

বিগত শতাব্দীর ষাটের দশক থেকে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নির্মাণ করে ৩৮ টি পোল্ডার। সত্তরের দশক পর্যন্ত এ পোল্ডার গুলো এলাকায় আশাতীত ফলাফল প্রদান করে। কিন্তু আশির দশকে এসে দেখা গেল এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া। একদিকে জলাবদ্ধতার বিস্তৃতি বাড়তে থাকে অন্যদিকে বৃদ্ধি পেতে থাকে অব্যাহত নদী ভাঙ্গন। নোনা পানি ও জলোচ্ছ্বাস প্রতিরোধ এবং এলাকাকে সারাবৎসর কৃষি ফসলের উপযোগী করার জন্য ডাচ প্রযুক্তি অনুসরণে প্রবর্তন করা হয় পোল্ডার ব্যবস্থা।

পোল্ডার ব্যবস্থার পূর্বে সাধারণত জমিদারদের তত্ত্বাবধানে স্থানীয় মানুষদের উদ্যোগে অস্থায়ী বাঁধবন্ধীর মাধ্যমে এলাকার মানুষ বিলে ফসল চাষাবাদ করতো। এ ধরণের বাঁধকে বলা হয় *অষ্টমাসী বাঁধ বা দশের বাঁধ।* তবে এ ধরণের বাঁধ ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট পরিমাণ ঝুঁকি বিদ্যমান ছিল। জোয়ারের তোড়ে বা ভরাগোনে বাঁধের অংশবিশেষ এলাকা প্রায় প্রতিবছর ভেঙ্গে যেতো। এতে ফসল উৎপাদনের একটা ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা সবসময় লেগে থাকতো। তাছাড়া বাঁধগুলো সংস্কার করা বা নতুনভাবে নির্মাণ করা ও রক্ষণাবেক্ষণে সমস্যা হতো। পঞ্চাশের দশকে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হওয়ার পর এ সমস্যার তীব্রতা অনেক বৃদ্ধি পায়। ১৯৫৪ ও ৫৫ সালের প্রলয়ংকারী বন্যায় পরিস্থিতির প্রকটতা অনেক গুণ বৃদ্ধি পায়। এ সবের পরিপ্রেক্ষিতে পোল্ডার ব্যবস্থা প্রবর্তন করে অস্থায়ী বাঁধ ব্যবস্থাকে মজবুত করে স্থায়ী করা হয়। এই স্থায়ী ব্যবস্থাই পরবর্তীকালে কাল হয়ে দেখা দিয়েছে।

সত্তর দশক পর্যন্ত পোল্ডার ব্যবস্থার মাধ্যমে এলাকায় আশাতীত ফলন নিশ্চিত করা গেছে, জনজীবনেও দেখা দিয়েছে বিশাল প্রাচুর্যতা। পোল্ডার ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর নৌপথের গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং স্থলপথের ব্যাপক সমৃদ্ধি ঘটে, এলাকায় দ্রুত গড়ে উঠতে থাকে বিভিন্ন ধরণের অপরিকল্পিত অবকাঠামো। পোল্ডার ব্যবস্থাকে এলাকার মানুষ আর্শীবাদ হিসাবেই গ্রহণ করেছিল কিন্তু আশির দশকে এটি অভিশাপ হিসাবে আবির্ভূত হলো।

পোল্ডার ব্যবস্থার আওতায় নিষ্কাশনের জন্য মূল কয়েকটি নদীকে রেখে অসংখ্য নদী বাঁধ দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। শুধুমাত্র বর্ষার পানি নিষ্কাশন করার জন্য বেঁধে দেওয়া এইসব নদী বা খালের মুখে স্থাপন করা হলো স্লুইজ গেট এবং নদীর পানি যাতে দু'কূল প্লাবিত করতে না পারে তার জন্য নদীর উভয়তীরে নির্মাণ করা হয় উপকূলীয় বাঁধ যা ওয়াপদার বাঁধ নামে এলাকায় পরিচিত। এ ব্যবস্থায় জোয়ারের পানি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লো নদীর মধ্যে। পূর্বে বিলে বা প্লাবণ ভূমিতে জোয়ারের পানি প্রবেশ করতো এবং সেখানে পলি অবক্ষেপিত হয়ে পলিমুক্ত পানি ভাটায় নেমে যেতো। রাতদিন ২৪ ঘন্টায় প্রত্যহ ২ বার ভাটা এবং ২ বার জোয়ার সংঘটিত হতো এসব প্লাবণ ভূমিতে। এতে একদিকে যেমন বিলের ভূমি গঠিত হয়ে উর্বর ভূমিতে পরিণত হতো অন্যদিকে নদীর নাব্যতার কোন সমস্যা সৃষ্টি হতো না। পোল্ডার ব্যবস্থা প্রবর্তনের দরুণ এখন সমস্ত পলিই নদী বক্ষে জমা হচ্ছে এবং নদীর বুক অভ্যন্তরীণ বিল খালের তুলনায় উঁচু হয়ে সৃষ্টি করছে জলাবদ্ধতার। জলাবদ্ধতা পূর্বে বিল খালের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল এখন তা বিল অতিক্রম করে জনপদ জনবসতি গ্রাস করে বন্যারূপে আবির্ভূত হচ্ছে এবং ক্রমান্বয়ে তার বিস্তৃতি ও তীব্রতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

নদ-নদীর মৃত্যু

পোল্ডার ব্যবস্থার আওতায় অবশিষ্ট যে কয়টি নদী বেঁচে ছিল সে সব প্রাণদায়িনী নদীগুলো অতিদ্রুত হারে মানুষের চোখের সামনে একে একে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে টেকা-মুক্তেশ্বরী, হামকুড়া, সালতা, মধ্যবর্তী ভদ্রা নদী মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। পার্শ্ববর্তী অন্যান্য নদীও মুমূর্ষু অবস্থায় মৃত্যুর প্রহর গুনছে। নদ নদীসমূহে জোয়ারের শেষ প্রান্ত থেকে নদী মরতে মরতে দক্ষিণ দিকে সাগর অভিমুখে ধাবিত হচ্ছে। প্রতি বছর এই সব নদীর মৃত্যুর হার গড়ে ৮/১০ কি.মি। এ হার প্রতি বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

CEGIS রিপোর্টে কপোতাক্ষ নদের ঝাঁপার বাওড়ে জোয়ারাধার বা টিআরএম বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হয়েছে। CEGIS রিপোর্ট প্রণীত হয় ২০০৪ সালে। এর মানে ২০০৪ সালে ঝাঁপার বাওড় পর্যন্ত জোয়ার প্রবাহিত হওয়ার সুযোগ ছিল। এখন জোয়ার প্রবাহিত হয় তালার মাগুরা পর্যন্ত। বিগত ৪ বৎসরে নদীর মৃত্যু ঘটেছে ৫৫কি.মি এবং মাগুরা থেকে জেঠুয়া বাজার পর্যন্ত ২২কি.মি. নদীর অবস্থা এখন মুমূর্ষুজনক। এলাকাবাসীর আশংকা আগামী ২/৩ বৎসরের মধ্যে পাইকগাছার শিববাড়ী পর্যন্ত কপোতাক্ষ নদ মুমূর্ষু অবস্থায় উপনীত হবে এবং পরবর্তীতে কপোতাক্ষ নদ সম্পূর্ণ বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হবে।

৮.২ ভূমির নিম্নগমন ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি

ভূ-তত্ত্ববিদদের অভিমত অনুযায়ী গোপালগঞ্জ অঞ্চলসহ সাতক্ষীরা-যশোর-খুলনার যে অংশ জলাবদ্ধ কবলিত সেই অংশ একটি গর্ত জাতীয় পীট বেসিন এলাকা। এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশে সারা বৎসর পানি জমা থাকে, সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে অনেক নীচুতে পানির তলের এই সমতল ভূমি যা জলাভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানকার মাটির রং কয়লা বা পীচের মতো, স্থানীয় ভাষায় এ মাটিকে জোব মাটি বলা হয়। এই মাটির মধ্যে প্রচুর পানি থাকে, মাটির গঠন অত্যন্ত আলগা ও শিথিল। ফলে এখানকার ভূমি বসে বা দেবে যাওয়ার (Earth Subsidence) হার অনেক বেশী। ড. মনিরুল হকের গবেষণামূলক তথ্যানুযায়ী প্রতিবৎসর ভূমি বসে যাওয়ার হার কমপক্ষে ২মি.মি।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো টেকটোনিক মুভমেন্ট। বিশেষজ্ঞ মহলে এ বিষয়টি সম্প্রতি বিশেষভাবে আলোচিত হচ্ছে যে, মহাদেশীয় যে টেকটোনিক বলয়ে আমরা বাস করছি তাতে পার্শ্ববর্তী টেকটোনিক বলয়ের চাপে বা সংঘর্ষে আমাদের এলাকা ক্রমান্বয়ে নিম্ন হচ্ছে এবং পার্শ্ববর্তী এলাকা উঁচু হয়ে পড়ছে। ফলে জলাবদ্ধ এলাকা আরো নীচু হওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একমাত্র পলি অবক্ষেপণের ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোনভাবে এখানকার জলাবদ্ধতা দূর করা সম্ভব নয়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ পরিকল্পনার সাথে যারা যুক্ত তারা ভূমি বসে যাওয়া বা টেকটোনিক মুভমেন্ট বিষয়টির প্রতি আদৌ গুরুত্ব আরোপ করছেন না।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে সাম্প্রতিক আলোড়িত ভয়াবহ বিষয় হলো সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি। জাতিসংঘের গবেষণা অনুয়ায়ী এ পর্যন্ত সমুদ্রের উচ্চতা ২২ সে.মি বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫ সাল থেকে আমাদের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল সমুদ্র গর্ভে বিলীন হতে শুরু করবে এবং এই অঞ্চল থেকে শুরু হবে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর মাইগ্রেশন।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের দেওয়া তথ্যানুযায়ী ইতিমধ্যে জোয়ারের উচ্চতা ১ফুট বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষিণ অঞ্চলের পোল্ডারের বাঁধ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে ৩ফুট আরো উঁচু করে নির্মাণ করা হচ্ছে। এলাকাতেও দেখা যাচ্ছে, যে সব এলাকা পূর্বে জোয়ার দ্বারা প্লাবিত হতো না সেসব এলাকা প্লাবিত হচ্ছে, প্রতি বৎসর প্লাবিত হওয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবং এইসব প্লাবণ প্রতিরোধ করার জন্য নদীতীরে স্থানীয় জনগন নির্মাণ করছে ছোট ছোট বাঁধ বা ভেড়ী। আশংকাজনক এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা উচিত, কেননা এ বিষয়টি এখন দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে।

একদিকে ভূমির নিম্নগমন এবং অন্যদিকে সমুদ্রের উচ্চতা বৃদ্ধি এই উভয়বিধ কারণে জলাবদ্ধতা ও বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে। এটি মোকাবেলার জন্য নদী তীরবর্তী বাঁধ যেমন উচুঁ করতে হবে অন্যদিকে বিলগুলোতে পলি অবক্ষেপন করে নিম্নভূমি উঁচু করে নিতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন পরিবেশ বান্ধব দৃষ্টিভংগীর।

৮.৩ মাথাভাঙ্গা প্রবাহ থেকে এলাকার বিচ্ছিন্নতা

মাথাভাঙ্গা ও ভৈরব নদী পদ্মার দুটি প্রধান শাখা নদী। দেড়শো বৎসর পূর্বে মাথাভাঙ্গা ও ভৈরবের যুক্ত প্রবাহ দ্বারা কপোতাক্ষ নদ পুষ্ট হতো। ভৈরব এখন পদ্মা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। ১৮৬২ সালে দর্শনায় রেলব্রীজ করার সময় পশ্চিম বঙ্গ অংশে ভৈরব নদী বেঁধে দেওয়া হয়। ফলে নদীয়া মুর্শিদাবাদের কোন বর্ষার পানি আর ভৈরব নদীতে প্রবাহিত হয় না।

বর্ষাকালে ৩/৪ মাস পদ্মা নদীর প্রবাহ মাথাভাঙ্গা নদীর মধ্যে প্রবাহিত হয় এবং মাথাভাঙ্গার পার্শ্ববর্তী উভয় তীরের উঁচু ভূমির চোঁয়ানো পানি অবশিষ্ট ৮/৯ মাস মাথাভাঙ্গায় একটি ক্ষীণ প্রবাহের সৃষ্টি করে। বাংলাদেশ অংশের ভৈরবের পানিও মাথা ভাঙ্গার সাথে যুক্ত হয়। এই পানি দর্শনার ভাটিতে কৃষ্ণগঞ্জ এসে ডাইনে চূর্ণী নদীতে এবং বামে ইছামতি নদীতে প্রবাহিত হয়। ফলে চূর্ণী ও ইছামতি নদীর নাব্যতা সংকট এখনও মারাত্মক পর্যায়ে উপনীত হয় নাই। এলাকার মানুষদের দেওয়া তথ্যানুযায়ী বর্ষাকালে মাথাভাঙ্গার পানির উচ্চতা ২০-২৫ ফুটের মতো বৃদ্ধি পায়। দর্শনা পয়েন্টে খাল কেটে পরিত্যক্ত নদী গভীর করা হলে ভৈরবের সাথে মাথা ভাঙ্গার সংযোগ সম্ভব হবে। অতীতে এ ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে কিন্তু উপযুক্ত তত্ত্বাবধান, রক্ষণাবেক্ষনের অভাবে সেসব উদ্যোগ বেশীদিন সফল হয়নি।

৮.৪ নদী-খাল দখল ও নিষ্কাশন পথে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা

ঊনিশ শত বিশ দশকের শেষ দিকে সেটেলমেন্ট ভূমি জরীপে ভৈরব ও কপোতাক্ষের ভরাট হওয়া বা বেদখলে চলে যাওয়া নদী ম্যাপভূক্ত করা হয়নি। পরবর্তীতে ম্যাপভূক্ত নদী ভরাট হয়ে যতটুকু চর জেগেছে বা ফসল চাষাবাদের উপযোগী হয়েছে তা অনেক জায়গায় সরকার থেকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে, অনেক জায়গা ভূমিদস্যু কর্তৃক জবরদখল করা হয়েছে। সরেজমিনে পরিদর্শন করে দেখা গেছে ম্যাপভূক্ত জমির ৭০ থেকে ৮০ ভাগ বেদখল হয়ে গেছে। বেদখলকৃত জমিতে ঘেরভেড়ী নির্মাণ, ফসল চাষাবাদ, ইটের ভাটা, বাড়ীঘর নির্মাণ এমনকি অনেক জায়গায় স্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে। জেগে উঠা চরকে শ্রেণী পরিবর্তন করে ভূমিহীনদের নামেও বন্দোবস্ত প্রদান করা হচ্ছে। এতে নিষ্কাশন সমস্যা আরো জটিল হচ্ছে।

পাইকগাছার শিববাড়ী থেকে দর্শনার চেকপোষ্ট পর্যন্ত জরীপ করে দেখা গেছে নদীর বুকে ৩৮টি ব্রীজ নির্মিত হয়েছে (সংযুক্তি-৩)। অধিকাংশ ব্রীজগুলোই নদীর মধ্যে পিলার যুক্ত।

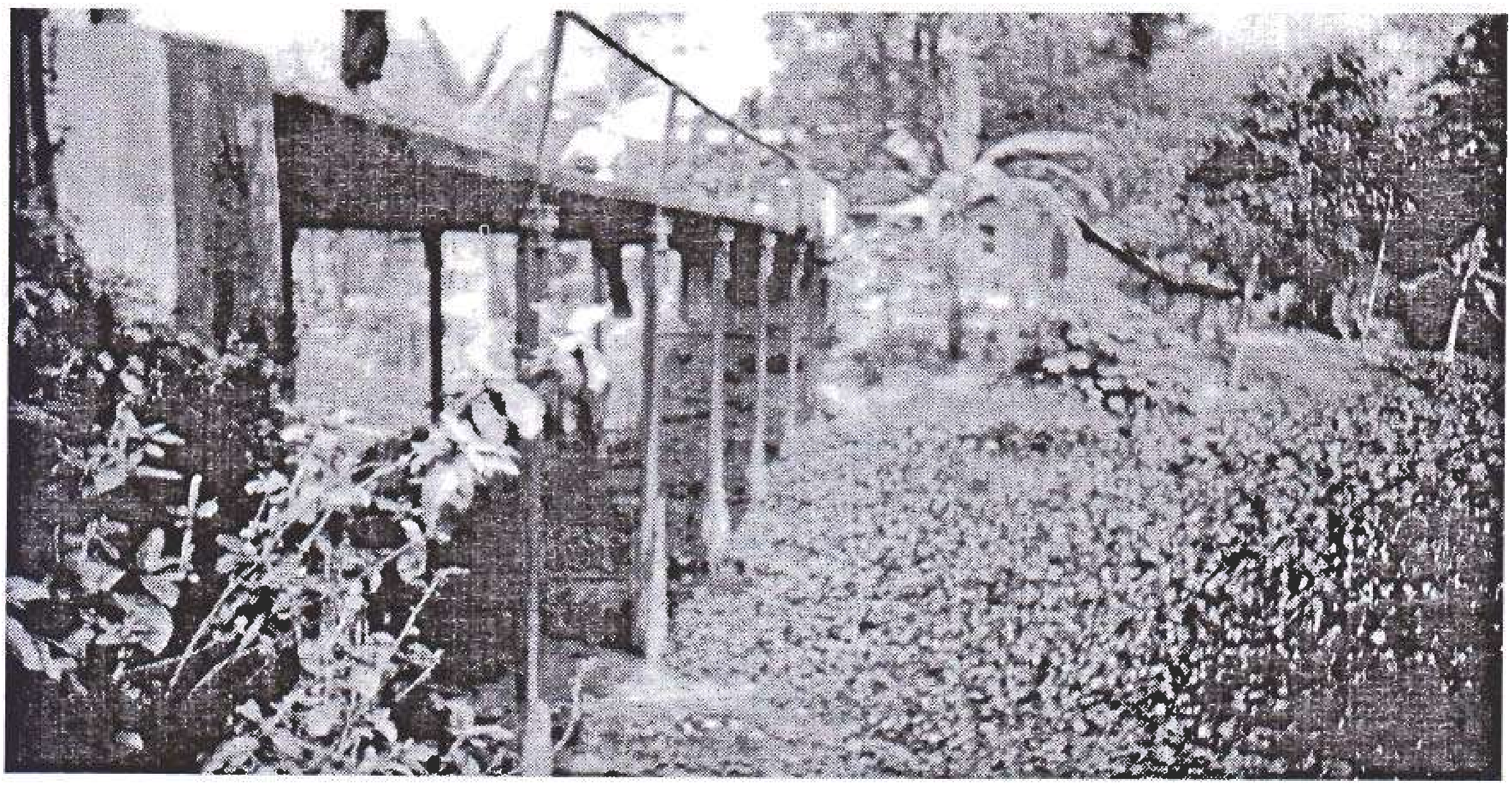

জীবননগরে ভৈরব নদীর উপর বৃটিশ আমলে নির্মিত লোহার পিলারযুক্ত ব্রীজ।

নদীর দুই পাশ যথাসম্ভব বেঁধে ব্রীজগুলো ছোট করে নির্মান করা হয়েছে ব্যয় সাশ্রয় এবং সহজে নির্মাণ করার জন্য। এসব ব্রীজের কারণে নদীর প্রস্থ ৫০-৭০ ভাগ পর্যন্ত হ্রাস পেয়েছে। এবং এর দরুণ নদী প্রবাহের গতিবেগ উল্লেখযোগ্য পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। সম্প্রতি নির্মিত তালা ও কপিলমুনির ব্রীজের কুফল এলাকার মানুষ স্বচক্ষে অবলোকন করেছে। এখানকার মানুষ এটি উপলব্দি করতে সক্ষম হয়েছে যে, ব্রীজের কারণেই নদী কত দ্রুত হারে ভরাট হয়েছে। ইতিমধ্যে সরসকাটি, তালা ও কপিলমুনি থেকে ব্রীজ অপসারণ করা যায় কিনা সেসব বিষয় নিয়ে এলাকার মানুষ প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে।

নদীর নাব্যতা হারিয়ে খেয়া চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়লে সেসব জায়গাতেও রাতারাতি অনেক বাঁশের সাঁকো বা চার নির্মিত হয়েছে পারাপারের জন্য। কপিলমুনি থেকে ঝিকরগাছা পর্যন্ত ৭টি সাঁকো নির্মাণ করা হয়েছে (সংযুক্তি-৪)। সাঁকোগুলোর নিষ্কাশন প্রবাহ ব্যাহত করার ক্ষমতা ব্রীজগুলোর তুলনায় অনেক বেশী। সাঁকোগুলো নির্মাণের জন্য নদীর বুকে খুবই অল্প ব্যবধানে অসংখ্য খুঁটি পোতা হয়েছে। বিভিন্ন রকম শ্যাওলা-কচুরিপানা প্রভৃতি বর্জ্য এসে এসব খুঁটিতে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে, তাতে পানির গতিবেগ দারুণভাবে ব্যাহত হয়। ব্রীজ বা সাঁকোর আগে পিছে স্রোতের গতিবেগ যেহেতু বাঁধাগ্রস্থ হয় সে কারণে আগে পিছে পলি ভরাটের পরিমাণ অনেক বেশী, এমনকি ব্রীজ বা সাঁকোর পিলারের মধ্যেও পলি জমে ভরাট হয়।

বিভিন্নভাবে নদীর মধ্যে মৎস্য আহরণের চেষ্টা চলে। এর মধ্যে বিপদজনক হলো ভেমটি জাল, কারেন্ট জাল নদীজুড়ে পাটা দেওয়া, কোমর দেওয়া প্রভৃতি। এগুলোর উপর কারো কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, যার যা খুশি মাছ ধরার জন্য সেই তাই করছে। নদীর মধ্যে এ ধরণের অপরিকল্পিত মাছ ধরার যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ব্যবহার করাতে নদীর প্রবাহে যেমন সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি ঐসব স্থানে অধিকহারে পলি জমে নদীর তলদেশ অসমতল হয়ে পড়ছে।

পানি নিষ্কাশনের জন্য কচুরিপানাও বড়ো ধরনের একটা সমস্যা। বর্ষার পানি যত বৃদ্ধি পায় সেই তালে তালে কচুরিপানাও অতি দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। বাড়তে বাড়তে বিশেষ করে বদ্ধ জলাশয় এলাকায় এত বৃদ্ধি পায় যা অতিক্রম করে নৌ চলাচল করা সম্ভব হয়ে উঠেনা। এগুলোর কিছু কিছু স্রোতের টানে ভাটিতে এসে ব্রীজে সাঁকোয় জালে পাটায় প্রভৃতিতে বেঁধে থাকে।

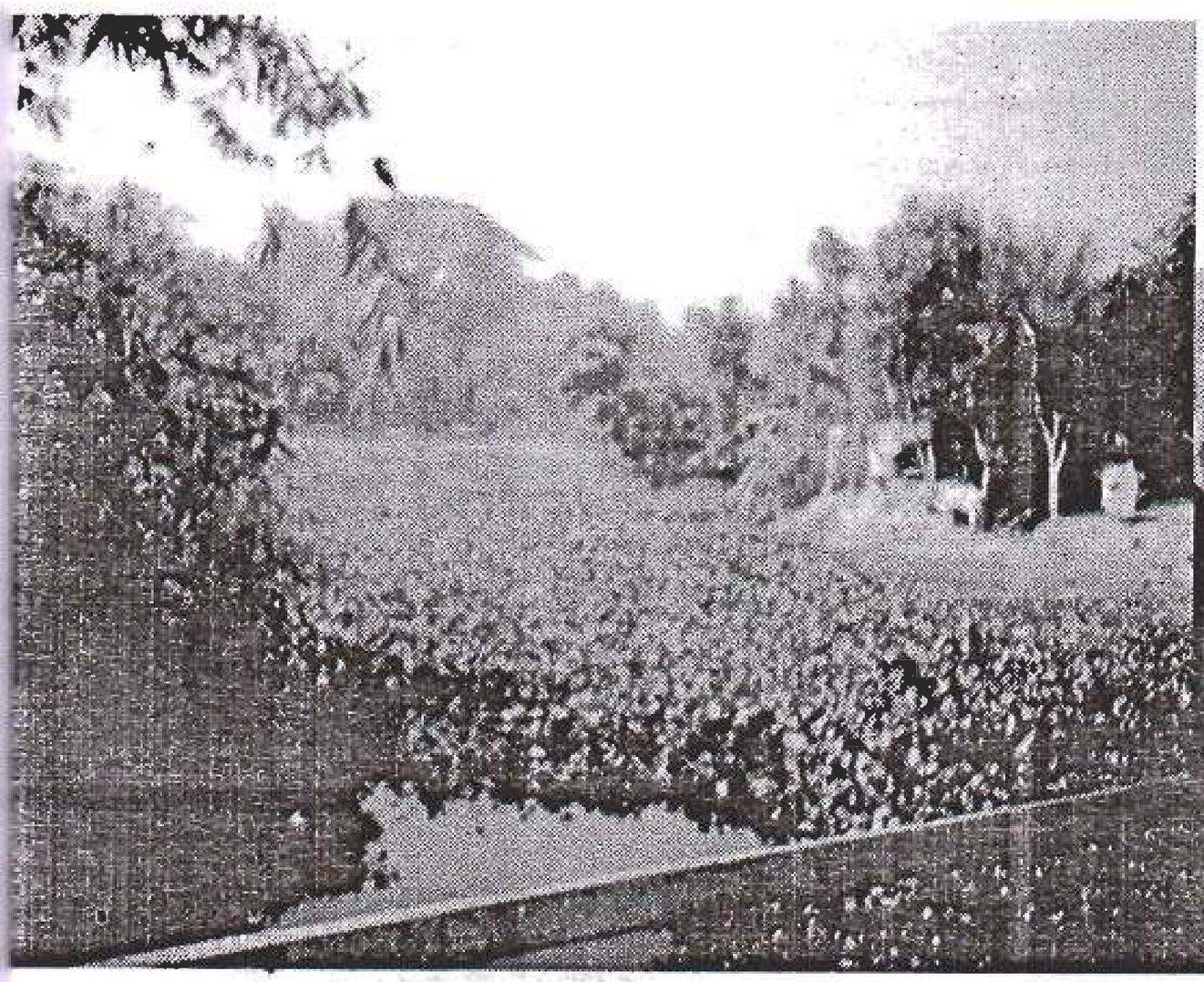

কচুরিপানায় পরিপূর্ণ কপোতাক্ষ নদের অংশ বিশেষ এলাকা।

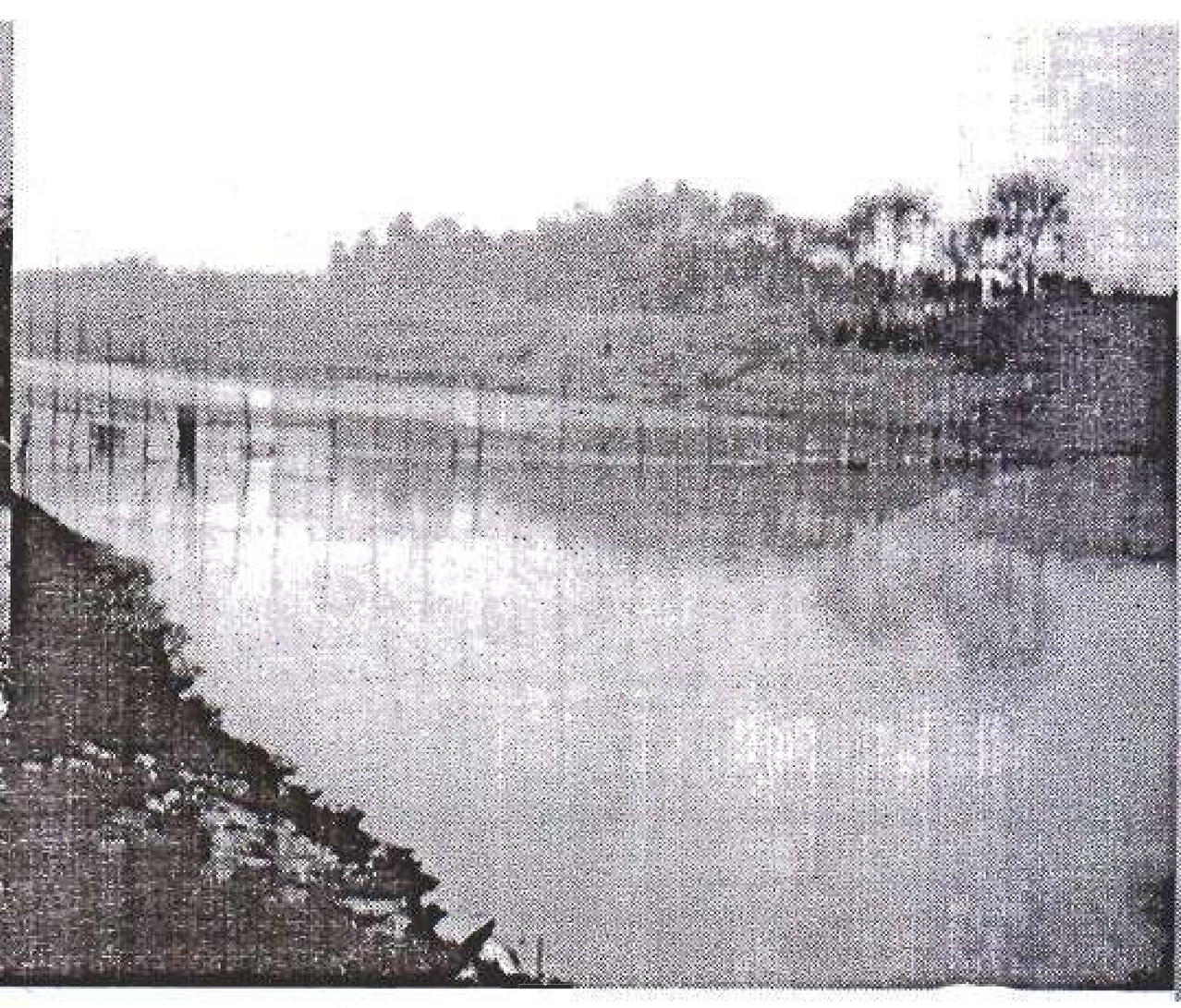

নদীর বুক জুড়ে পাটা স্থাপন।

বিলের মধ্যে অভ্যন্তরীন খালেও রয়েছে বিভিন্ন রকমের সমস্যা। কচুরিপানা, শ্যাওলা, বেদখল করে খাল সংকুচিত করা, খালের মধ্যে পাটা কোমর দেওয়া, স্লুইজ গেটের মুখে জাল পেতে মাছ ধরা, ঘেরের মধ্যে খাল অবরুদ্ধ করে ফেলা এবং বিভিন্ন জায়গায় খালের উপর অপ্রশস্ত ব্রীজ-কালভার্ট নির্মাণ এবং স্লুইজ গেটের আগে পিছে পলি ভরাট প্রভৃতি কারনে অভ্যন্তরীন পানি ঠিকমত নিষ্কাশিত হতে পারে না।

স্লুইজ গেটগুলোর যান্ত্রিক ত্রুটি বিচ্যুতি নেই এমন কোন স্লুইজ গেট খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে (সংযুক্তি-৫)। গেটগুলোর সব থেকে বড়ো সমস্যা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষন সমস্যা। জনস্বার্থে স্লুইজগেট গুলো পরিচালিত হয় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘের মালিকরা ও মৎস্য শিকারীরা তাদের স্বার্থে স্লুইজ গেট উঠানামা করে। স্লুইজ গেট গুলোর সাধারণ সমস্যা হলো কপাটের সমস্যা, কপাট উঠানো নামানো অত্যন্ত কঠিন কাজ। অনেক গেটের কপাট নাই বা ছিদ্রযুক্ত। রবার সীল ও ছোটখাট নাটবল্টুর সমস্যা লেগেই আছে। যথানিয়মে যন্ত্রপাতিতে গ্রীস দেওয়া হয় না। এবং কপাটসমূহ রং করা হয় না।

এলাকার মানুষ একথা ভেবে বিস্মিত যে খুবই অল্প পয়সায় মামুলি এ ধরণের কাজ কেন করা হচ্ছে না? একটু তত্ত্বাবধান এবং সামান্য টাকা খরচ করলে এসবের দ্বারা যে পরিমাণ উপকার পাওয়া যেতো লক্ষ-লক্ষ কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে যে সব প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে তাতেও সে পরিমাণ উপকার নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। নদীতীরে অনেক জায়গায় কোন নিয়ন্ত্রণ কাঠামো না থাকায় সেসব খালদ্বারা জোয়ারের পানি বা বর্ষার উজান পানি প্রবেশ করে এলাকা প্লাবিত করে থাকে।

৯. সমস্যা সমাধানে উত্তরণ ও পানি কমিটির ভূমিকা

যশোর-খুলনা ও সাতক্ষীরা অঞ্চলে দীর্ঘ ২২ বৎসর যাবৎ উত্তরণ ও পানি কমিটি জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, সুপেয় পানি নিশ্চিতকরণ এবং পরিবেশ সমস্যা নিয়ে কাজ করছে। পানি কমিটি সুশীল সমাজের গণপ্রতিনিধিত্বশীল একটি স্বাধীন সংগঠন। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার উদ্যোগী মানুষ পানি কমিটির সাথে সম্পৃক্ত। বিল ডাকাতিয়া ও ভবদহ এলাকার জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য কেজেডিআরপি প্রকল্পের বিরুদ্ধে পানি কমিটি জনগণকে সাথে নিয়ে বিভিন্ন ধরণের কার্যক্রম বাস্তবায়ন এবং জাতীয় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ্যাডভোকেসী লবিং কাজ সম্পন্ন করেছে। টিয়াবুনিয়া ও কাসিমপুর রেগুলেটর নির্মাণ কাজ বন্ধ করা, টিআরএম প্রতিষ্ঠা করা এবং দাতা সংস্থা এডিবি কর্তৃক কেজেডিআরপি কার্যক্রম মূল্যায়ন প্রভৃতি পানি কমিটির দীর্ঘ কার্যক্রমের ফসল। অবশ্য এসব কার্যক্রমে এলাকায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে উঠা অন্যান্য গণ সংগঠনসমূহের ভূমিকা ও অবদান রয়েছে। পানি কমিটি এসব সংগঠন, প্রশাসন ও বিভিন্ন দপ্তরের সংগে সমন্বয়ের চেষ্টা করে থাকে।

কপোতাক্ষ নদের সমস্যা মোকাবেলায় পানি কমিটির পক্ষ থেকে ব্যাপক ভূমিকা গ্রহণ করা হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জনপদ এলাকার সার্বিক পরিস্থিতির উপর জরীপ কাজ সম্পাদন করা, এলাকার জনগণকে সংগঠিত করা, ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার দৃষ্টি আকর্ষন, বিভিন্ন জেলা উপজেলা প্রশাসনের মধ্যে সমন্বয়ে সহায়তা করা এবং জাতীয়ভাবে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পানি উন্নয়ন বোর্ড, CEGIS, IWM প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানকে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণে সক্রিয় করা। উত্তরণ এসব কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত থেকে বিভিন্ন ধরণের সাপোর্ট সার্ভিস প্রদান করে যাচ্ছে।

বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পনি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা, সচিব, পানি উন্নয়ন বোর্ড, CEGIS ও IWM এর সাথে পানি কমিটির মিটিং।

কপোতাক্ষ নদের সমস্যা সমাধানে পানি কমিটি নেতৃবৃন্দের আলোচনা।

সবথেকে যেটি আশাব্যঞ্জক বিষয় তা হলো কর্তৃপক্ষ স্থায়ী ও টেকসই সমাধানের লক্ষ্যে কর্মসূচী গ্রহণে সম্মত হয়েছে। অন্তবর্তীকালীন টিআরএম বাস্তবায়নের জন্য ইতিমধ্যে IWM কর্তৃক টেকনিক্যাল এবং CEGIS কর্তৃক সামাজিক জরীপ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। এ দুটি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক স্থায়ী সমাধানের জন্য স্ট্যাডি কাজ সম্পন্ন করা হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন। প্রতিষ্ঠান ২টির সাথে পানি কমিটির সক্রিয় যোগাযোগ রয়েছে। পানি কমিটি বর্তমানে সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচিত এমপি, মন্ত্রী এবং মহাজোট সরকারের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রেখেছে।

এসব কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে কর্তৃপক্ষ ত্বরিত গতিতে তালা এলাকায় যান্ত্রিকভাবে নদী খনন, বিকল্প পথে পানি নিষ্কাশন এবং নদীর প্রবাহে বাঁধা সৃষ্টিকারী প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে যার পরিপ্রেক্ষিতে একটু বিলম্বে হলেও জলাবদ্ধতা ও বন্যা পরিস্থিতি কিছুটা সহনশীল পর্যায়ে নামানো সম্ভব হয়েছে।

১০. সমস্যা সমাধানে সরকারী পদক্ষেপ

টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের লক্ষ্যে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে কার্যকরী কর্মসূচী প্রণয়ণ ও বাস্তবায়ন করতে হলে একটি স্ট্যাডি কাজ সম্পন্ন করতে হবে। স্ট্যাডি কাজ সম্পন্ন করতে কমপক্ষে এক বৎসর সময়ের প্রয়োজন। স্ট্যাডি কাজের উপর ভিত্তি করে প্রকল্প প্রণয়ন, অনুমোদন এবং বাস্তবায়ন কাজ শুরু করতে সময় লাগবে আরও এক বৎসর। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে একথা বলা যায় বিভিন্ন রকম দীর্ঘসূত্রতার কারণে অতিরিক্ত আরও এক বৎসর সময় বেশী লেগে যেতে পারে। জনগণের পক্ষ থেকে প্রশ্ন উঠেছে ২ বৎসর হোক অথবা ৩ বৎসর হোক এই অন্তবর্তীকালীন সময়ে কিভাবে বন্যা ও জলাবদ্ধতা সমস্যা মোকাবেলা করা হবে?

১০.১ পানি উন্নয়ন বোর্ডের জরুরী ও স্বল্পমেয়াদী কর্মসূচী

অন্তবর্তীকালীন সময়ে বন্যা ও জলাবদ্ধতা সমস্যা মোকাবেলার জন্য পানি উন্নয়ন বোর্ড নিম্নোক্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

১) যান্ত্রিক উপায়ে নদীতে একটি প্রণালী সৃষ্টি করা

কপোতাক্ষের সুড়িঘাটা থেকে কপিলমুনির গোলাবাড়ীর নিম্নে জেঠুয়া বিল পর্যন্ত দীর্ঘ প্রায় ৩০ কি.মি. নদীর বক্ষদেশ পলি জমে অস্বাভাবিক উঁচু হয়ে পড়েছে। নদীর এই উঁচু অংশের মধ্যে একটি প্রণালী সৃষ্টি করার জন্য বিগত ৫ মাস যাবৎ যান্ত্রিক উপায়ে খনন কাজ চলছে।

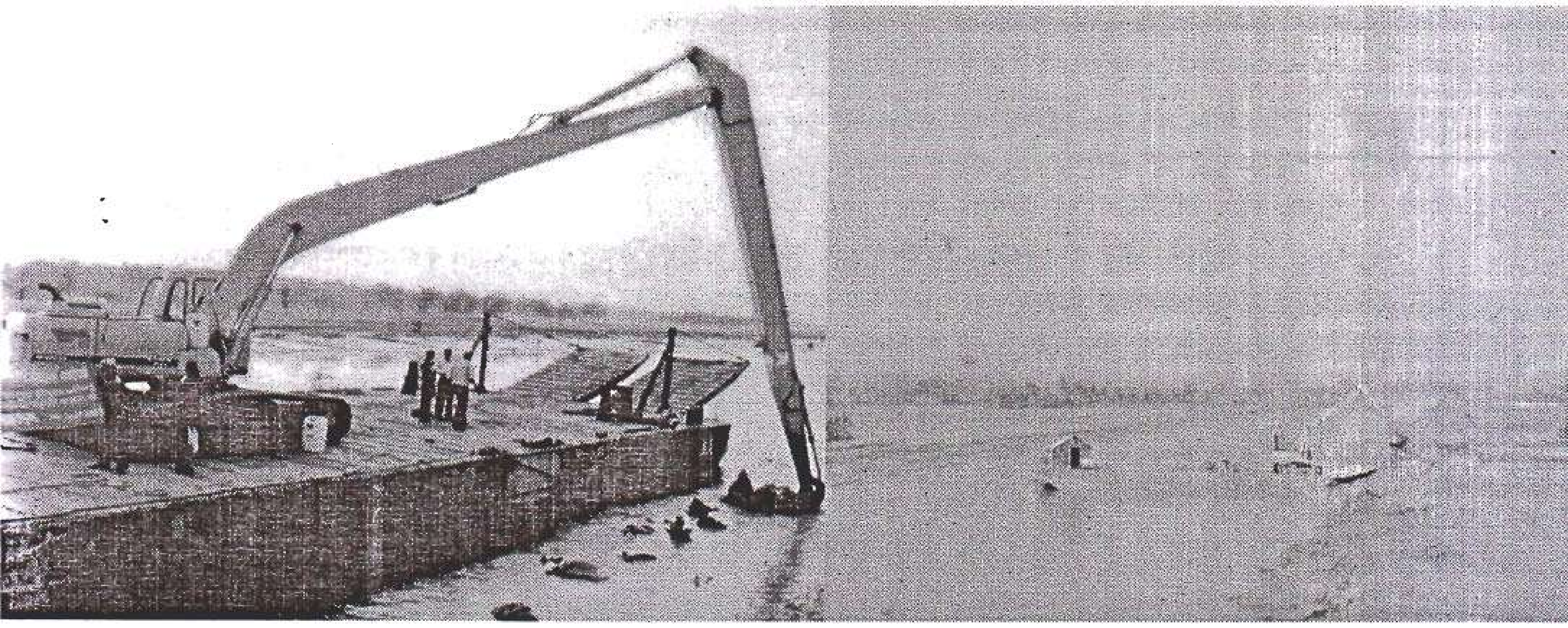

এক্সকেভেটর মেশিন দ্বারা তালায় কপোতাক্ষ নদের খনন।

এ খনন কাজের জন্য একটি মিনি ড্রেজার, দুটি এক্সকেভেটর মেশিন ও একটি উভচর মেশিন নিয়োজিত রয়েছে। কর্তৃপক্ষ আশা করছেন এ মেশিনগুলোর মাধ্যমে নদীতে একটি প্রণালী সৃষ্টি করা সম্ভব হবে এবং এ প্রক্রিয়ায় আগামী বর্ষা মৌসুমের পানি নিষ্কাশন করা সম্ভব হবে।

২) বিকল্প বুড়ীভদ্রার পথে পানি নিষ্কাশন

কপোতাক্ষের ত্রি-মোহিনীতে বহুকাল পূর্বে বুড়ীভদ্রা কপোতাক্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। কর্তৃপক্ষ মনে করছে বুড়ীভদ্রার সাথে কপোতাক্ষের পুনঃসংযোগ দেওয়া সম্ভব হলে জলাবদ্ধতা দূরীকরণ সম্ভব হবে।

৩) কিছু এলাকায় বন্যা প্রতিরোধক বাঁধ নির্মাণ:

কপোতাক্ষের তীরবর্তী যে সব এলাকা ব্যাপক ভাবে প্লাবিত হয় এমন ধরণের কিছু জায়গায় নদী তীরবর্তী বাঁধ নির্মান করা হবে যাতে তীর উপচিয়ে ঐসব এলাকা প্লাবিত না হয়।

পর্যালোচনা: উল্লেখ্য যে এ বিষয়টি অবগত হওয়া গেছে, বুড়ীভদ্রা দিয়ে পানি নিষ্কাশন ও প্রতিরোধ বাঁধ নির্মাণ কার্যক্রম কেবলমাত্র যশোর এলাকায় বাস্তবায়িত হবে যশোর পওর সার্কেলের মাধ্যমে। সাতক্ষীরা পওর সার্কেল থেকে অদ্যাবধি কোন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়নি। তবে যশোর পওর সার্কেল থেকে যে সব প্রস্তাবনা সমূহ গ্রহণ করা হয়েছে তা জনগণের মনঃপুত হয়নি।

যান্ত্রিক উপায়ে প্রণালী সৃষ্টি করে আগামী বর্ষা মৌসুমে বন্যা ও জলাবদ্ধতা মোকাবেলা করা কোনভাবেই সম্ভব নয়। বিগত ৫ মাসে নদীতে মাত্র ৫/৬ কি.মি. প্রণালী তৈরী করা সম্ভব হয়েছে। বর্ষা মৌসুমের পূর্বে আরও ১৫/২০ কি.মি প্রণালী তৈরী করা আদৌ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ এখন পলি মৌসুম শুরু হয়েছে। মেশিনগুলোর পশ্চাতে পলি জমে কাটা প্রণালী ইতিমধ্যে ভরাট হতে শুরু করেছে। অবস্থা এমন পর্যায়ে উপনীত হওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী যে, পলি ভরাটের দরুণ মেশিনগুলো নদী থেকে আর বের হতে পারবে না। অতীতে হরিনদী ও শোলমারী নদীতে এমন ধরনের ঘটনা ঘটেছে।

কপোতাক্ষ নদীও ২বার ড্রেজার মেশিন দ্বারা খনন করা হয়েছে। তার ফলাফলও সুখকর নয়। বর্তমান পলি জমে নদীবক্ষ যে পরিমান উঁচু হয়েছে সেটিও ঐসব ড্রেজিং এর প্রত্যক্ষ ফল। সুতরাং অতীত অভিজ্ঞতায় একথা বলা যায় যে পলি মৌসুমে মেশিন দিয়ে নদী খনন করা হলে এর পশ্চাতে নদী ভরাট হয়ে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হবে। সে কারণে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নদী থেকে মেশিনগুলো প্রত্যাহার করা হবে সমীচীন।

বিকল্প বুড়ীভদ্রা পথে পানি নিষ্কাশন কাজটি হবে অত্যন্ত কঠিন কাজ। বুড়ীভদ্রার বিচ্ছিন্ন অংশ সরকার থেকে বহুকাল পূর্বে স্থায়ী বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে। সেই সুবাদে ভরাট হওয়া নদীর উপর পূর্ব পুরুষানুক্রমে বিভিন্ন স্থাপনা, মৎস্যঘের, ধানক্ষেত, রাস্তা-কালভার্ট নির্মান করা হয়েছে। ফলে আইনী জটিলতা এবং সামাজিক বাঁধার কারণে এ প্রস্তাবনা কার্যকরী করা কঠিন হবে।

বুড়ীভদ্রার সংশ্লিষ্ট এলাকা এর দ্বারা প্লাবিত হতে পারে-এই আশংকায় ঐ সব এলাকার পক্ষ থেকেও এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করা হচ্ছে। তাছাড়া বুড়ীভদ্রা পুনঃসংযোগ প্রস্তাব কার্যকরী হলে কপোতাক্ষের নিম্নাংশ নাব্যতা সংকটে পতিত হবে। এসব বিষয় বিবেচনা করে সমীচীন এবং উপযুক্ত হবে এমন ধরণের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা যাতে কপোতাক্ষ নদীকে পুনরুজ্জীবিত করা যায় এবং তার নাব্যপ্রবাহ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। এ ধরণের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করা হলে আই ওয়াশমূলক বন্যা প্রতিরোধক বাঁধ নির্মাণেরও প্রয়োজন হবে না। তবে কপোতাক্ষের সংগে মাথাভাঙ্গার সংযোগ দেওয়া সম্ভব হলে ঐ পানি প্রবাহের একটি অংশ বুড়ীভদ্রা নদীতে প্রবেশ করানো যেতে পারে।

১১. সমস্যা সমাধানে জনগণের দাবী ও প্রস্তাবনা সমূহ

সমস্যা জর্জরিত কপোতাক্ষ পাড়ের মানুষ প্রতিবৎসর আর এ সমস্যার মুখোমুখি হতে চায় না। ত্রাণ ও সাময়িক উপশমমূলক কর্মসূচীর পরিবর্তে তারা এ সমস্যার স্থায়ী ও টেকসই সমাধান চায়। পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে এই এলাকার মানুষদের দীর্ঘদিনের এবং তার উল্লেখযোগ্য অংশ বংশ পরম্পরা থেকে প্রাপ্ত।

পোল্ডারের পূর্বে এলাকায় অষ্টমাসী বা দশের বাঁধ চালু ছিল। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে নদীর পাশে বাঁধ দিয়ে একটি ফসল চাষাবাদ করা হতো। পানি নিষ্কাশনের জন্য স্থাপন করা হতো কাঠের বাক্সকল। বিলের গভীর অংশ থাকতো সারা বৎসর উন্মুক্ত। এ প্রক্রিয়া ছিল প্রকৃতির সংগে এক ধরণের সহাবস্থান। এতে বিলের মধ্যে বা নীচুজমিতে পলি অবক্ষেপিত হতে পারতো এবং নদীর নাব্যতার কোন সমস্যা হতো না। মৎস্য সম্পদে ছিল এলাকা পরিপূর্ণ এবং নৌ-পথের কোন সমস্যা হতো না। তবে বাঁধবন্দীতে সব সময় ভেংগে যাওয়ার ঝুঁকি বিরাজ করতো। পানি উন্নয়ন বোর্ড লোকায়ত এই ব্যবস্থা মজুবত করার পন্থা গ্রহণ করলে পোল্ডারের কার্যকারিতা আরো দীর্ঘদিন মানুষ ভোগ করতে পারতো। এ ব্যবস্থার পরিবর্তে নদী বেঁধে দেওয়া এবং প্লাবণ ভূমিতে জোয়ারের অনুপ্রবেশ প্রতিরোধমূলক স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্যই পরিণামে জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয়েছে।

জলাবদ্ধতা দূরীকরণে নদীখাল খনন, ড্রেজিং, অবকাঠামো সংস্কার প্রভৃতি কার্যক্রম যখন বারবার ব্যর্থতায় পর্যবসতি হতে লাগলো তখন পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রতি আস্থা হারিয়ে এলাকার মানুষ স্ব-উদ্যোগে গ্রহণ করলো বিলের মধ্যে অবাধ জোয়ার ভাটা ব্যবস্থাপনা। এ পদ্ধতির পরিকল্পিত নাম বিলের মধ্যে জোয়ারাধার ব্যবস্থাপনা বা Tidal River Management, সংক্ষেপে TRM। জনগণ উদ্ভাবিত এ পদ্ধতি কার্যকর বলে সরকারীভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

বিগত ২০-২৫ বৎসর জলাবদ্ধতা সমস্যা সমাধানে পর্যাপ্ত পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হয়েছে কিন্তু সমস্যার কোন সুরাহা হয়নি বরং সমস্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর মূল কারণ জনগণের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা প্রকল্প প্রনয়ণে যুক্ত করা হচ্ছে না এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে জনগণকে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে না। প্রকল্পের সাথে এ ২টি বিষয় সম্পৃক্ত না হওয়া পর্যন্ত জলাবদ্ধতা ও বন্যার অভিশাপ থেকে এলাকাবাসীকে উদ্ধার করা সম্ভব হবেনা।

১২. অন্তবর্তী কালীন জরুরী নিষ্কাশন পরিকল্পনা

টেকসই ও মধ্যমেয়াদী সমাধানের জন্য কর্মসূচী বাস্তবায়ন শুরু করতে কমপক্ষে ২/৩ বৎসর সময়ের প্রয়োজন হবে বলে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সংগত কারণেই নদীকে টিকিয়ে রাখা এবং ভোগান্তি প্রশমনের জন্য অন্তবর্তীকালীন নিষ্কাশন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে যে সব পদক্ষেপ গ্রহণ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা দ্বারা আদৌ বন্যা ও জলাবদ্ধতা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। অন্তবর্তীকালীন নিষ্কাশনের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে।

১. জেঠুয়া-কৃষ্ণকাটি বিলে টিআরএম বাস্তবায়ন।
২. কপিলমুনির গোলাবাড়ীর নিম্নে বিল জেঠুয়া থেকে সুড়িঘাটা পর্যন্ত ম্যানুয়ালী নদী খনন এবং
৩. নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন ও জরুরী সংস্কার।

জরুরী নিষ্কাশন পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হলো ৩টি । যথাক্রমে:

আগামী বর্ষা মৌসুমে জলাবদ্ধতা ও বন্যা মোকাবেলা করা।
জেঠুয়া-কৃষ্ণকাটি বিলের নিম্নে বা ভাটিতে নদীকে নাব্য রাখা।
পোল্ডার অভ্যন্তরের বর্ষার পানি কোন প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই যাতে নদীতে এসে পড়তে পারে তার ব্যবস্থা করা।

১২.১ জেঠুয়া কৃষ্ণকাটি বিলে টিআরএম বাস্তবায়ন

এ বিলের নিম্নে বা ভাটিতে নদী এখনও কিছুটা নাব্য আছে। এখনও এ পর্যন্ত যে পরিমাণ জোয়ার প্রবাহিত হয় তাতে বিলের মধ্যে জোয়ার-ভাটা চালু করা গেলে নিঃসন্দেহে নিম্নে নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। জেঠুয়া বিলের উজানে যেটুকু জোয়ার উঠে তাতে উপরের কোন বিলে টিআরএম বাস্তবায়ন সফল হবে না। আর যদি এ শুকনো মৌসুমে জেঠুয়া বিলে টিআরএম ব্যবস্থা চালু করা না যায় তাহলে এই শুকনো মৌসুমেই নিম্নে নদী আরও ১৫-২০ কি.মি. ভরাট হয়ে নিষ্কাশনের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। পরবর্তীতে টিআরএম করতে হলে তার নিম্নে কোন বিলে করতে হবে।

টি আর এম কি ?

টিআরএম হলো বিলের মধ্যে জোয়ার-ভাটা চালু করা। এ ব্যবস্থায় নদী তীরে বাঁধকেটে সরাসরি বিলের মধ্যে জোয়ার-প্রবেশের সুযোগ করে দেওয়া হয়। রাতদিন ২৪ ঘণ্টায় বিলের মধ্যে দুই বার জোয়ার এবং দুই বার ভাটা হয়। জোয়ারের সাথে আগত পলি বিলের মধ্যে জমা হয় এবং পলিমুক্ত পানি ভাটার সময় বের হয়ে যায়। এতে পলি নদীবক্ষে অবক্ষেপিত হতে পারেনা বরং নদী ক্রমান্বয়ে গভীর থেকে গভীরতর হয় এবং নীচু বিল পলি জমে উঁচু হয়ে সারাবৎসর চাষাবাদের উপযোগী হয়।

অতীতে বিল ডাকাতিয়া, বিল ভায়না, বুড়ুলী, পাথরা প্রভৃতি বিলে এ পদ্ধতি সফল বলে প্রমাণিত হয়েছে যার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারীভাবে ভবদহ এলাকার বিল কেদারিয়ায় এ পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়। বর্তমানে খুকশিয়া বিলে এ পদ্ধতি চালু আছে। সরকারীভাবে এ পদ্ধতির নাম Tidal River Management, সংক্ষেপে TRM এবং বাংলায় জোয়ার ভাটার নদী ব্যবস্থাপনা বা জোয়ারাধার ব্যবস্থাপনা। এ পদ্ধতি জনগণ উদ্ভাবিত পদ্ধতি। সরকারীভাবে এ পদ্ধতির স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে *'টিআরএম পদ্ধতি অর্থনৈতিক দিক দিয়ে লাভজনক, পরিবেশ বান্ধব, প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে বাস্তবায়নযোগ্য এবং জনগণের কাছে অতিমাত্রায় গ্রহণযোগ্য।'*

বিশেষজ্ঞগণ এ ধরণের অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, সমগ্র উপকূলীয় এলাকার সমাধানের ক্ষেত্রে এ পদ্ধতি একটি বিশাল সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে, শুধু তাই নয়, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের উপকূল এলাকাতেও এ পদ্ধতি চালু করা যেতে পারে। কপোতাক্ষ নদের সমাধানকল্পে ২০০৪ সালে CEGIS তার স্টাডি রিপোর্টে ঝাঁপা বাওড় বা খাজুরা বাওড়ে এ পদ্ধতি প্রবর্তন করার সুপারিশ করেছিল। কিন্তু অদ্যাবধি কর্তৃপক্ষ সে সুপারিশ বাস্তবায়নের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করে নাই। এখন উক্ত বাওড়ে টিআরএম বাস্তবায়নের কোন সুযোগ নাই, কেননা নদীর জোয়ার আর উক্ত বাওড় পর্যন্ত পৌছায় না। এখন টিআরএম বাস্তবায়ন করতে হলে করতে হবে জেঠুয়া-কৃষ্ণকাটি বিলে।

জেঠুয়া-কৃষ্ণকাটি বিল

সাতক্ষীরা জেলার তালা উপজেলার জালালপুর ইউনিয়নে জেঠুয়া বিলটি অবস্থিত। জেঠুয়া, কৃষ্ণকাটি এবং চর কানাইদিয়া গ্রামের আংশিক এলাকা নিয়ে এ বিলটি গঠিত। বিলটির আয়তন ১৮০ হেক্টর। বিলে আমন ও বোরো উভয় ধরণের চাষাবাদ হয়ে থাকে। আমন ও বোরো চাষের মাঝখানে বিরতির সময় অর্থাৎ জৈষ্ঠ্য মাসের শেষ থেকে ভাদ্র মাস পর্যন্ত বিল উঁচু করে নেওয়ার জন্য এলাকার মানুষ বিলে জোয়ার ভাটা উঠায়। বিগত ৩ বৎসর যাবৎ এ ব্যবস্থা অব্যাহত আছে। পানি কমিটি ও CEGIS এ বিলের জনসাধারনের সাথে একাধিক বার মত বিনিময় করেছে। উক্ত বিলে টিআরএম চালু বিষয়ে জনগন অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেছে। জনগনের সাথে মত বিনিময়ের প্রেক্ষিতে CEGIS কর্তৃক একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। উক্ত রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে জনগণের মতামত তুলে ধরা হলো।

জেঠুয়া বিলে টিআরএম বিষয়ে জনগণের মতামত

১। নদী বাঁচাতে জনগনের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পরিকল্পিতভাবে টিআরএম কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে।

২। বিল ভরাট হয়ে চাষাবাদের উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত বিলের উপর নির্ভরশীল জনগোষ্ঠীর কোন রকম বেঁচে থাকার উপযোগী যৌক্তিক হারে ফসলের ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

৩। দরিদ্র-দুঃস্থ, অসহায় ও শ্রমজীবীদের জন্য ভিজিএফ, ভিজিডি, বয়স্কভাতা, বিধবা ভাতা, টিআরএম, কাবিখা প্রভৃতি কার্যক্রম বাস্তবায়নসহ অন্যান্য অনুদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪। বিলে সুষ্ঠু পলি ব্যবস্থাপনার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে বিল ভরাটের বিষয়টি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়। এক্ষেত্রে সকল পেশাজীবীদের সমন্বয়ে একটি টিআরএম ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করতে হবে।

৫। পলি জমে বসতি এলাকার তুলনায় যাতে বিল বেশী উঁচু না হয় এবং সব জায়গায় যাতে পলি সমানভাবে বণ্ঠিত হতে পারে সেদিকে এ কমিটি খেয়াল রাখবে।

৬। গ্রাম প্রতিরক্ষা বাঁধ এমন উচ্চতায় নির্মান করতে হবে যাতে সর্বোচ্চ জোয়ারের পানি বসতি এলাকায় প্রবেশ করতে না পারে।

৭) খাল সমূহ পুনঃখনন করে বিলের শেষ প্রান্তে পলি নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং বিলে যতদিন কাংখিত মাত্রায় পলি ভরাট না হয় ততদিন পর্যন্ত টিআরএম অব্যাহত রাখতে হবে।

৮) ক্ষতিপূরণ প্রদানের ক্ষেত্রে টিআরএম বাস্তবায়ন কমিটির সহায়তা নিতে হবে যাতে জমির মালিক, লীজ ও বর্গাগ্রহীতার মধ্যে সুষ্ঠুভাবে সমন্বয় সাধন হয়।

জেঠুয়া বিলে টি আর এম বিষয়ক CEGIS আয়োজিত মত বিনিময় সভা।

টিআরএম বাস্তবায়নে পানি কমিটির পূর্ব অভিজ্ঞতা রয়েছে। বিল কেদারিয়া ও খুকশিয়া বিলে পানি উন্নয়ন বোর্ড বাস্তবায়িত টিআরএম কার্যক্রমে যথেষ্ট অবহেলা ও উদাসীনতা লক্ষ্য করা গেছে যার ফলশ্রুতিতে বিলে কাংখিত মাত্রায় পলি অবক্ষেপিত হয়নি এবং পলি বণ্ঠনও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়নি। এ বিলেও অনুরূপ অবস্থার পুনরাবৃত্তি কাম্য নয়।

বিল কেদারিয়া ও খুকশিয়া বিলের জন্য CEGIS প্রনীত পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Environment Management Plan) বাস্তবায়ন করা হয়নি। টিআরএম বিলে জোয়ার ভাটার কারণে প্রাকৃতিক মৎস্য আহরনের বিশাল সম্ভাবনা রয়েছে, এ সম্ভাবনার পাশাপাশি বিলের মধ্যে মেলে-হোগলার চাষ, লবণ সহনশীল ধান চাষ, কাঁকড়া চাষ প্রভৃতি চাষাবাদ করা যেতে পারে খুব সহজে, পেরিফেরিয়াল গ্রাম প্রতিরক্ষা বাঁধেও বিভিন্ন রকম ফসল চাষাবাদ করা যেতে পারে। বিলবাসী বিল রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন কাজে অর্জনকৃত এসব অর্থ ব্যয় করতে পারবে। ফলে এর দ্বারা বিলবাসী স্বাবলম্বী হবে এবং প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলে বিল রক্ষণাবেক্ষণে এলাকার জনগণের আর কোন সমস্যা হবেনা।

IWM *প্রনীত রিপোর্ট*

জেঠুয়া ও নদীর অপর তীরে অবস্থিত হরিদাসকাটি এ দুটি বিলের উপর স্টাডি কাজ সম্পন্ন করে IWM একটি রিপোর্ট প্রণয়ন করেছে। উক্ত রিপোর্টে বলা হয়েছে "It is seen That Beel Haridaskati is not Much effective to increase the tidal prism, whereas Beel Jetua is effective to increase tidal flow and to avoid Further deterioation of the downstream stretch of the kobadak river for at best two years"

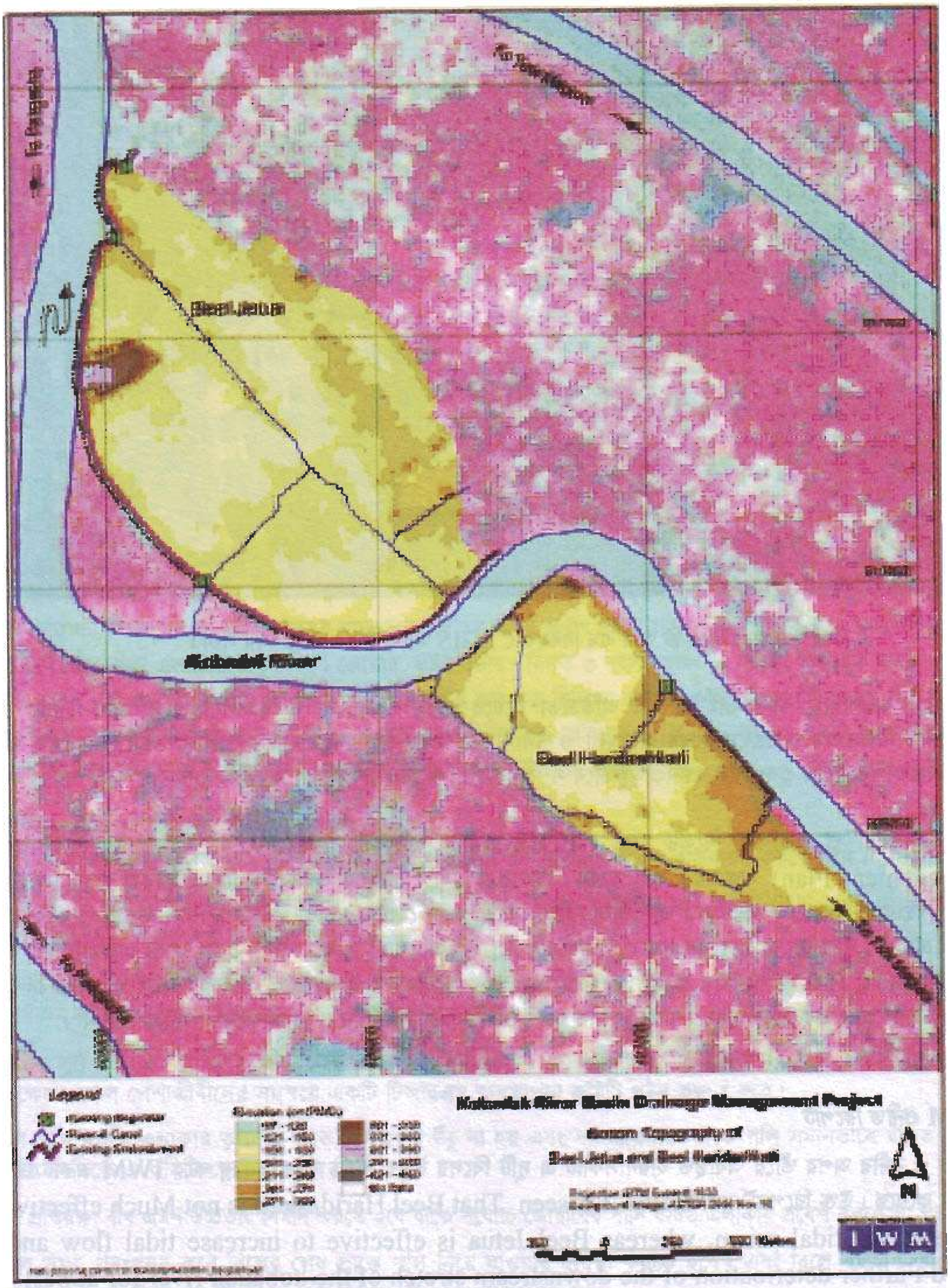

এ বক্তব্যে এটি পরিষ্কার হয় যে ২ বৎসরের মধ্যে বিল জেঠুয়াতে কাংখিত মাত্রায় বিল ভরাট হয়ে যাবে এবং নিম্নের নদীর নাব্যতার উন্নয়ন ঘটবে। IWM থেকে এ আশংকাও প্রকাশ করা হয়েছে যে যদি বিল জেঠুয়াতে টিআরএম চালু করা না হয় তাহলে নিম্নে ১০ কি.মি. নদী ভরাট হয়ে নিষ্কাশনের অনুপযোগী হয়ে পড়বে এবং জেঠুয়ার উপর অংশে আরো পলি জমে পরিস্থিতি বর্তমানের তুলনায় ভয়াবহ হবে।

১২.২ *ক্রসড্যাম দিয়ে ম্যানুয়ালী নদী খনন*

একদিকে জেঠুয়া বিলে টিআরএম বাস্তবায়ন অন্যদিকে বিলের উজানে নদীখনন এ দুটি বিষয় সফলতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য বিল জেঠুয়ার উজানে ক্রসড্যাম বা নদীর উপর মাটির বাঁধ দিতে হবে। ক্রসড্যামের কারণে জোয়ার যথেষ্ট গতিবেগ নিয়ে টিআরএম বিলে প্রবেশ করতে পারবে এবং জোয়ারের সাথে আগত সমস্ত পলির অনুপ্রবেশ ঘটবে বিলের মধ্যে। এতে ২ বৎসরের মধ্যেই বিল ভরাট হয়ে চাষাবাদের উপযোগী হবে।

ক্রসড্যাম দেওয়া না হলে বিলবাসী প্রত্যাশিত পলি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হবে, বিল ভরাট হতে সময় লাগবে অনেক বৎসর এবং উজান এলাকার নদীও দ্রুত পলি দ্বারা ভরাট হবে। তাছাড়া ক্রসড্যাম দেওয়া ছাড়া নদী খনন করাও সম্ভব হবেনা। নদী খননের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে।

জেঠুয়া বিলের উজান থেকে পাটকেলঘাটার উজানে সুড়িঘাটা পর্যন্ত দীর্ঘ ৩০ কি.মি নদী খনন করতে হবে। এ জন্য নদীর উভয় অংশে বাঁধ দিয়ে নদীর পানি পাম্প আউট করে খননের ব্যবস্থা করতে হবে। পানি উন্নয়ন বোর্ড অতীতে পার্শ্ববর্তী অনেক নদীতে এ ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।
নদী থেকে সকল ধরণের দখল উচ্ছেদ করে যথাসম্ভব সি.এস রেকর্ড অনুযায়ী নদী খননের ডিজাইন করতে হবে।
নদী খননের পলিমাটি যত্রতত্র স্তুপ করা ঠিক হবে না। তাহলে জোয়ারের বা বর্ষার পানিতে ধুয়ে এসে আবার নদীতে পড়বে। এ জন্য উত্তোলিত মাটির ব্যবস্থাপনা ও ব্যবহারের ব্যবস্থা নিতে হবে।
নদীর খনন অংশের সকল বেডলেভেল সমান রাখতে হবে। বিভিন্ন সেকশনের বেডলেভেল অসামঞ্জস্য থাকলে যে সকল বেডলেভেল ডিজাইন অনুযায়ী কাটা হয়েছে তা দ্বারা কোন লাভ পাওয়া যাবেনা।
নদী খনন কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর সকল ধরণের ক্রসড্যাম যথাযথভাবে অপসারণ করতে হবে এবং নদীর বক্ষে কোথাও উঁচু অংশ রাখা যাবেনা।
জরুরীভাবে যাতে ব্যবহার করা যায় তার জন্য একটি উভচর মেশিন ও একটি এক্সকেভেটর মেশিন সার্বক্ষণিক মজুদ রাখতে হবে।
কাজের কোয়ালিটি কন্ট্রোল ও উদ্ভুত বিভিন্ন সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য জনগণকে সম্পৃক্ত করে একটি মনিটরিং বা সুপারভিশন টীম গঠন করতে হবে।
নদী খননের কাজ কন্ট্রাক্টরের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে করাতে হবে। এতে কাজের গুণগত মান রক্ষা, জনগণের অংশগ্রহণ এবং উত্তোলিত মাটি স্তুপের ব্যবস্থাপনা কাজটিও সহজ হবে।

১২.৩ *নিষ্কাশন ব্যবস্থার জরুরী সংস্কার ও উন্নয়ন*

নিষ্কাশন ব্যবস্থার জরুরী সংস্কার ও উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হলো অভ্যন্তরীণ বর্ষার পানি যাতে বিনা বাঁধা বা প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই নদীতে এসে পড়তে পারে। অতীতে এ ধরণের কাজের প্রতি আদৌ গুরুত্ব আরোপ করা হয়নি। ফলে অভ্যন্তরীণ পানি ব্যবস্থাপনা একটা হযবরল অবস্থায় পতিত হয়েছে। জরুরীভাবে নিম্নোক্ত কাজগুলো যথাসময়ের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে।

- পোল্ডারের প্রায় সকল স্লুইজগেটসমূহে বিভিন্ন যান্ত্রিক ত্রুটি বিচ্যুতি লক্ষ্য করা যায়। এগুলো দূর করতে হবে। যেমন: রাবার সীল, নাট-বল্টু, গ্রীজ ও কপাটসমূহ রং করা। যেসব গেটের কপাট নাই বা কপাট ছিদ্রযুক্ত তা ঠিক করা।
- যে সব স্লুইজ গেটের ভিতরে, আগে ও পিছে পলি ভরাট হয়েছে তা অপসারণের ব্যবস্থা করা।
- স্লুইজ গেট ও খাল পরিচালনা কমিটি গঠন করা।
- নিয়ন্ত্রণ কাঠামো না থাকায় যে সব খাল দ্বারা জোয়ারের পানিতে এলাকা প্লাবিত হচ্ছে সেই সব খালে পাইপগেট বা বাক্সকল স্থাপন করা।
- নদীর ভাংগন ও জোয়ারের প্লাবণ প্রতিরোধ করা। কপিলমুনি বাজার, জেঠুয়া ও বালিয়া বাজার রক্ষা করা। কাসিমনগরের জেলেপাড়া, জেঠুয়া ও বোয়ালিয়ার জেলেপাড়া এবং মাহমুদকাটি রামনাথপুর এলাকার অধিবাসীদিগকে রক্ষা করা।

- অভ্যন্তরীণ খালে বিভিন্ন ধরণের প্রতিবন্ধকতা যেমন মৎস্য ঘের, খাল দখল, অপরিকল্পিত মৎস্য আহরণ, কচুরিপানা-শ্যাওলা প্রভৃতি অপসারণ।
- নদী থেকে বাশের সাঁকো বা চারসমূহ উচ্ছেদ করা।
- নদী থেকে কচুরিপানা-শ্যাওলা এবং জাল-নেট -কোমর ও অন্যান্য স্থাপনাসমূহ অপসারণ করা এবং
- বন্যায় বিধবস্ত জনগুরুত্বপূর্ন রাস্তাসমূহ জরুরী ভিত্তিতে মেরামত করা (সংযুক্তি-৬)।

১৩. *টেকসই মধ্যবর্তী পরিকল্পনা*

টেকসই ব্যবস্থা হিসেবে জনগণের মধ্যে যে সব বিষয়গুলো আলোচিত হচ্ছে তার মূল বিষয় হলো অববাহিকার সুবিধামূলক জায়গায় একাধিক টিআরএম বাস্তবায়ন এবং মাথাভাঙ্গা নদীর সাথে কপোতাক্ষ নদের পুনঃসংযোগ প্রদান। এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন হলে জলাবদ্ধতা দূরীকরণের পাশাপাশি এলাকার ভৌগলিক ও পরিবেশগত সমস্যারও উন্নয়ন ঘটবে। যে সব উপকার পাওয়া যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

টিআরএম কার্যক্রমের দরুন বিল ভরাট হয়ে বিল সারা বৎসর চাষাবাদ উপযোগী হবে।

টিআরএম চলাকালীন সময়ে টিআরএম বিলগুলো মাছসহ বিভিন্ন জীববৈচিত্র্যের বিচরণ ক্ষেত্রে পরিনত হবে এমনকি বিল ভরাট হওয়ার পর অন্যান্য স্থলপ্রাণী ভরাট হওয়া বিলে বিচরণ করতে পারবে। বিল ভায়না ও ডাকাতিয়া বিলের বাস্তবায়িত টিআরএম এক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

ভরাটকৃত বিলগুলো হবে উর্বরভূমি এবং সম্পূর্ন বন্যামুক্ত।

কপোতাক্ষ নদে মাথাভাঙ্গা থেকে পানির অনুপ্রবেশ ঘটানো সম্ভব হলে দর্শনা থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত নদীকে সারা বৎসর নাব্য রাখা সম্ভব হবে।

মিঠা পানির প্রবাহের কারণে দক্ষিণাঞ্চলের লবণাক্ততার তীব্রতা হ্রাস পাবে বিশেষ করে সুন্দরবনের বিপর্যয় প্রতিরোধ করা অনেকটা সম্ভব হবে।

এলাকার ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নীচে নেমে যাচ্ছে। দেশের উত্তরাঞ্চলের পাশাপাশি এখন দক্ষিণাঞ্চলেও খরা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ জেলায় মরুময় প্রক্রিয়া এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কপোতাক্ষের উজানে সংযোগ এবং টিআরএম বাস্তবায়ন এই উভয় প্রক্রিয়া দ্বারা আশা করা যায় ভূ–গর্ভস্থ পানির স্তর বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে। শুধু তাই নয় ভূ–পৃষ্ঠেও পানি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে পানিকে বহুমুখী কাজে ব্যবহার করা যাবে। আর্সেনিক সমস্যা মোকাবেলা করা যাবে। সর্বোপরি ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-গর্ভস্থ এই বর্ধিত পানি এলাকায় অনুকূল আবহাওয়া ও জলবায়ু গঠনে সহায়ক হবে। নদী আর বদ্ধ জলাশয় হিসাবে বিবেচিত হবে না। ফলে স্বাস্থ্যগত সমস্যার উন্নয়ন এবং নদীতে কচুরিপানা-শ্যাওলা জন্মাতে পারবেনা।

নদী এবং বিকল্প জলাধারে মৎস্য সম্পদের বিশাল প্রাচুর্যতা ঘটবে। জলাধার বিশেষ করে বাওড়গুলোকে অভয়ারন্য হিসাবে গড়ে তোলা সম্ভব হবে এবং নদীও জীব বৈচিত্র্যের বিচরণ ও প্রজননের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসাবে গড়ে উঠবে।

নদীতে নৌ-চলাচল বৃদ্ধি পাবে। ফলে নদী তীরের শহর-বন্দর-গঞ্জ আবারো পূর্বের মতো জেগে উঠবে, মানুষের কল কাকলিতে থাকবে মুখরিত।

একথা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা যে ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-গর্ভস্থ পানি বৃদ্ধি করা ছাড়া অন্য কোনভাবে এলাকার পানি সমস্যা ও পরিবেশ সমস্যা দূর করা সম্ভব নয়। সমগ্র বিষয়টিকে কেবল সনাতনী কায়দায় নিষ্কাশন ব্যবস্থার আলোকে দেখা হলে ভুল করা হবে। নিষ্কাশন আর পরিবেশ এ দুটি বিষয়কে আর আলাদাভাবে দেখার কোন সুযোগ নাই। মাথাভাঙ্গা নদী থেকে কপোতাক্ষ নদের বিচ্ছিন্নতা এবং পোল্ডার ব্যবস্থা এ দুটি কারণেই ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির মারাত্মক স্বল্পতা দেখা দিয়েছে। শুরু হয়েছে জলাবদ্ধতা, বন্যা, খরা-লবণাক্ততা ও নদীভাঙ্গন। সুতরাং পোল্ডার ব্যবস্থার রিডিজাইন এবং এলাকার সাথে উজান প্রবাহের সংযোগ ছাড়া অন্য কোনভাবে এলাকার উদ্ধারমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করা হলে তা দ্বারা উন্নয়নের পরিবর্তে হিতে বিপরীত হবে।

১৩.১ অববাহিকায় একাধিক টিআরএম বাস্তবায়ন

সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, ভূমির নিম্নগমন এবং জলাবদ্ধতা সমস্যা মোকাবেলার জন্য বিভিন্ন বিলে টিআরএম বাস্তবায়ন অব্যাহত রাখতে হবে। যে সব বিলগুলোর ভূমিতল সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতার চেয়ে নিম্নতর সে সব বিলগুলো টিআরএম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়া উচিত। IWM রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে সফলভাবে নদীর নাব্যতা ধরে রাখার জন্য ৬০০-৮০০ হেক্টর এলাকায় টিআরএম বাস্তবায়ন প্রয়োজন। দক্ষিণাঞ্চলের ২/১ টি বিল ছাড়া অন্যান্য কোন একটি বিলে এতো জায়গা পাওয়া কঠিন হবে। প্রয়োজনে এক সাথে একাধিক টিআরএম বাস্তবায়ন করতে হবে।

তবে টিআরএম বাস্তবায়ন শুধু নিষ্কাশনের প্রয়োজনে করতে হবে বিষয়টি এভাবে না দেখে আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখতে হবে। বিশেষ করে টিআরএম বিলে বিভিন্ন রকম উৎপাদনমূলক কার্মকান্ড চালু করা, বিলের পানি বহুমুখী কাজে ব্যবহার, জীববৈচিত্র্য বিচরণের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সমস্ত কর্মকান্ডে জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে নিশ্চিত করতে হবে।

নদীজ প্রতিবেশ (River ecology) উদ্ধারের জন্য টিআরএম কার্যক্রম একটি বিশাল সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র। খাড়িবহুল জোয়ার-ভাটার নদীগুলোর সাথে প্রতিবেশ সম্পর্ক রয়েছে সুন্দরবন এবং প্লাবনভূমির। নদী ও সুন্দরবনের জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণ বৈচিত্র্য সমূহের প্রজনন ঘটে নদীর স্রোতে, প্লাবনভূমি এদের বিচরণ ক্ষেত্র। সুতরাং প্লাবনভূমির সাথে নদীর সংযোগ হলে পূর্বের পরিবেশ প্রতিবেশ আবার ফিরে আসবে।

পলি ব্যবস্থাপনা

আমাদের এ অঞ্চলের ভূমি পলিমাটি দ্বারা গঠিত। উজান থেকে আগত বন্যার পানি এবং প্রতিদিনের জোয়ারের পলিদ্বারা এখানকার প্লাবনভূমি গঠিত হচ্ছিল। এ দুটি প্রক্রিয়া এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে পলিমাটি দ্বারা এখন নদী ভরাট হচ্ছে, সুন্দরবনের ভূমি উঁচু হচ্ছে এবং সমুদ্র মোহনার গভীরতা হ্রাস পাচ্ছে।

পর্যাপ্ত পরিমানে ভূমি চাষাবাদ, গাছপালা উজাড় প্রভৃতি কারণে ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পাচ্ছে, নদী ভরাটের কারণে নদী ভাঙ্গন অব্যাহত আছে। এসবের দরুন পূর্বের তুলনায় নদীতে পলির আগমন ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। লবনাক্ততা বৃদ্ধির জন্য নদীর পানিতে পলি ধারন ও অবক্ষেপনের পরিমানও বৃদ্ধি পাচ্ছে। নদী ভরাটের পাশাপাশি পলির একটা উল্লেখযোগ্য অংশ অবক্ষেপিত হয় সুন্দরবনে যার ফলে সুন্দরবনের অনেক এলাকায় ভরাগোনে (ভরাকটাল) ছাড়া স্বাভাবিক জোয়ার উঠতে পারে না। সুন্দরবনের নদী খাল ভরাট হচ্ছে, বৃক্ষের শ্বাসমূল আচ্ছাদিত হচ্ছে এবং এসবের কারনে সুন্দরবনের অস্তিত্ব এখন হুমকীর মুখে পড়েছে।

জানুয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত পলি মৌসুম ধরা হয়। ৮০-৮৫ ভাগ পলি এ মৌসুমে নদীতে অবক্ষেপিত হয়। জানুয়ারী মাস থেকে ক্রমান্বয়ে পলির আগমন বৃদ্ধি পায়। দক্ষিন-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু এবং সমুদ্র স্রোতের কারণে দক্ষিণ ভারতীয় এবং মেঘনা মোহনার পলির উল্লেখযোগ্য অংশের অনুপ্রবেশ ঘটে আমাদের এ এলাকায়। সে কারণে দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল এলাকায় পলির আগমন সব থেকে বেশী।

সুতরাং একথা আর বলার অপেক্ষা রাখেনা যে সুষ্ঠু পলি ব্যবস্থাপনা ছাড়া এখানকার জলাবদ্ধতা ও পরিবেশ সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। জনগন উদ্ভাবিত একটি সহায়ক পদ্ধতি হলো পলিকে বিলের মধ্যে যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। পলি অবক্ষেপনে বিলের ভূগঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে, নদী নাব্য থাকবে, সুন্দরবনের উন্নয়ন ঘটবে এবং এলাকায় পরিবেশ উন্নয়নে এ পদ্ধতি হবে সহায়ক। অন্যদিকে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও ভূমির নিম্নগমন- এ দুটি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হলে পলি দ্বারা ভূ-ভাগ উঁচু করা ছাড়া অন্যকোন পদ্ধতি প্রয়োগ করে কাংখিত ফলাফল পাওয়া যাবে না।

১৩.২ মাথাভাঙ্গা নদীর সাথে সংযোগ সাধন

প্রায় দেড়শো বৎসর পূর্বে মাথাভাঙ্গার সাথে কপোতাক্ষের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। মাথাভাঙ্গা নদীতে যদি বন্যার উচ্চতা বৃদ্ধি পায় তবেই দর্শনার চেকপোস্ট স্থান থেকে বন্যার পানি ভৈরব নদীর মাধ্যমে কপোতাক্ষ অববাহিকায় প্রবেশ করে। ২০০০ সালে এমন ঘটনা ঘটেছিল। স্বাভাবিকভাবে উজান পানি কপোতাক্ষে প্রবেশ করেনা। বিভিন্ন বিকল্প পথে মাথাভাঙ্গার সাথে সংযোগ প্রদান করা যেতে পারে।

বিকল্প-১

দর্শনা চেকপোস্ট থেকে পুরনো নদী খনন করে এ সংযোগ দেওয়া যায়। তবে এ সংযোগের বিভিন্ন রকম সমস্যা আছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দর্শনা চেকপোস্ট থেকে নিমতলা ফাঁড়ি পর্যন্ত ৪ কি.মি. পরিত্যক্ত নদী ভারত বাংলাদেশ সীমান্তে যা এখন উভয় দেশের মানুষের দখলে চাষাবাদ হচ্ছে।

বিকল্প-২

দর্শনার জয়নগর বা শ্যামপুরের খাল প্রশস্ত করে সিংনগর বাওড়ের যে কোন মুখে সংযোগ প্রদান করা যেতে পারে।

বিকল্প-৩

দামুড়হুদার পার্শ্বে পুরনো চিত্রা নদী যেখান থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে সেখান থেকে বা পার্শ্ববর্তী সুবিধাজনক কোন জায়গা থেকে রুদ্রনগরের খালের সাথে সংযোগের মাধ্যমে নিম্নে হঠাৎপাড়া রেলওয়ে ব্রীজের পুরনো খাত দিয়ে দুধ পাতলের বিল হয়ে সিংনগর বাওড়ে সংযোগ প্রদান করা যেতে পারে।

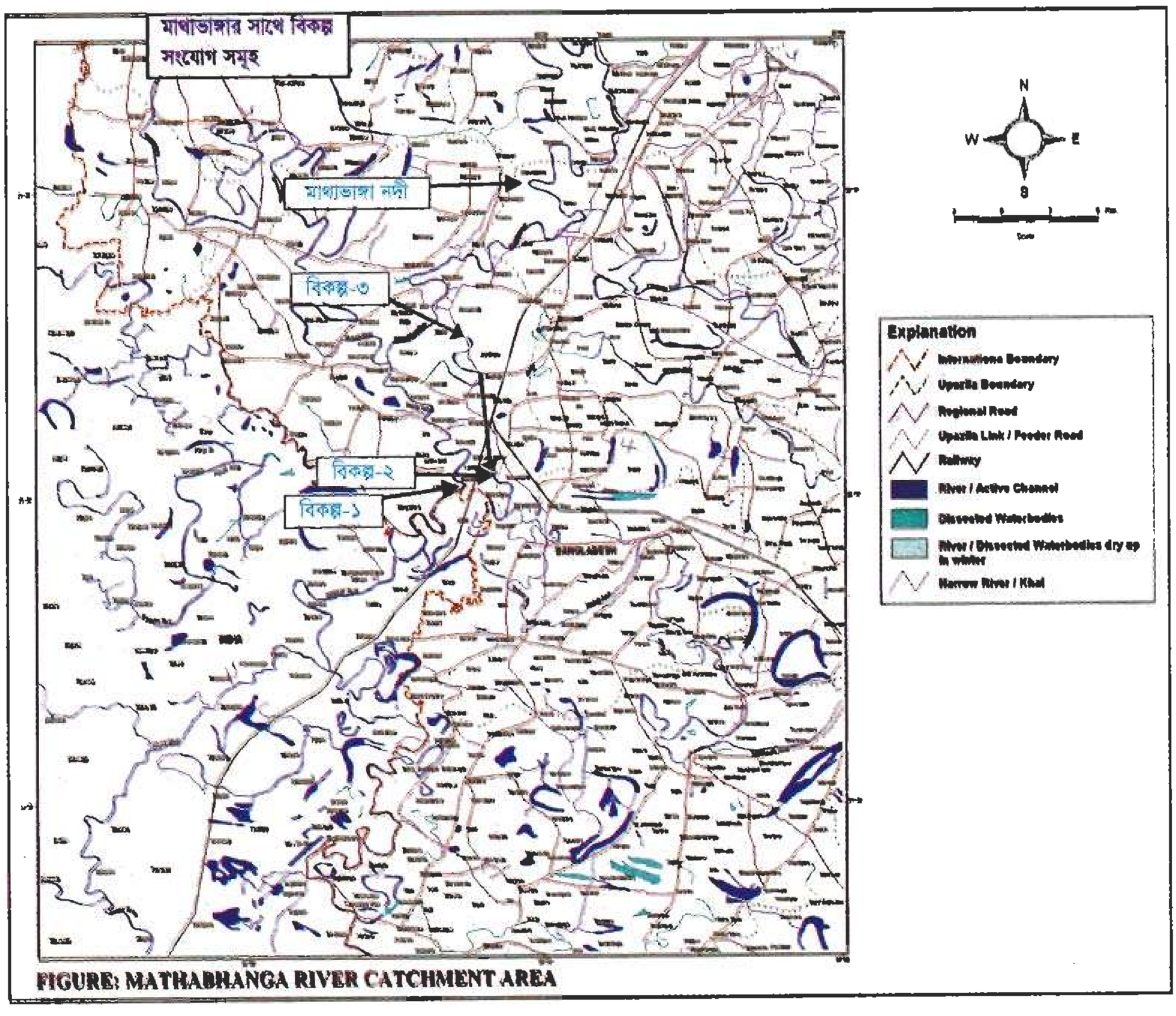

FIGURE: MATHABHANGA RIVER CATCHMENT AREA

১৩.৩ নদী খনন

তবে সংযোগ যেখান থেকেই দেওয়া হোক না কেন প্রশস্ত করে নদী খনন করতেই হবে। ভৈরব, মাথাভাঙ্গা এবং কপোতাক্ষ প্রতিটি নদী খননই সংশ্লিষ্ট এলাকার মানুষের কাছে একটি জনপ্রিয় দাবীতে পরিণত হয়েছে। সব এলাকার মানুষই মনে করে উপরোক্ত বিকল্পসমূহ বাস্তবায়ন ও নদী খনন করা হলে এর দ্বারা সব এলাকার মানুষই উপকৃত হতে পারবে।

সুবলপুর ঘাটের উজানে আপার ভৈরব নদী, মাথাভাঙ্গা নদী এবং দর্শনা থেকে ভৈরব-কপোতাক্ষের ঝিকরগাছা পর্যন্ত নদী খননের প্রয়োজন হবে। ঝিকরগাছা থেকে ধানদিয়া পর্যন্ত নদী গভীর থাকলেও প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে। তবে সব এলাকার মানুষদের দাবী বৈধ হোক আর অবৈধ হোক সকল ধরণের নদী দখল উচ্ছেদ করে যতোটা সম্ভব ম্যাপ অনুযায়ী নদী খননের ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রয়োজনে নদীর উপর নির্মিত ছোট ব্রীজগুলোর পাশে আরো খাত করে তার উপর ব্রীজ নির্মাণ করতে হবে।

বর্তমানে বর্ষাকালে ৩/৪ মাস মাথাভাঙ্গার সাথে পদ্মা নদীর সংযোগ ঘটে এবং সারা বৎসর উঁচু ভূমির চোঁয়ানো পানি মাথাভাঙ্গায় প্রবাহিত হয়। কপোতাক্ষের সাথে সংযোগ হলে বর্ষাকালীন পানি এবং অন্যান্য সময়ের চোঁয়ানো পানিও কপোতাক্ষে প্রবাহিত হবে।

১৩.৪ বিল বাওড়ে পানি সংরক্ষণ

কপোতাক্ষ ভৈরব নদী সিস্টেমে ৪২টি বাওড় আছে (সংযুক্তি তালিকা-৭)। বাংলাদেশের অন্য কোন নদীর এতো সংখ্যক বাওড় নেই। এ বাওড়গুলোর পাড় উঁচু করে বর্ষাকালীন পানি এর মধ্যে খুব সহজে সংরক্ষণ করা যায়। প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করে বাওড়গুলোকে লীজ প্রদান বন্ধ করতে হবে এবং সকল ধরণের দখল থেকে বাওড়গুলোকে মুক্ত করতে হবে। এলাকার মানুষ বাওড়গুলোকে মুক্ত দেখতে চায় এবং বাওড়গুলো যাতে অভয়ারণ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় এলাকার মানুষ তার পক্ষে।

মানুষ মনে করে বাওড়ের মধ্যে যে সব দেশী মাছ জন্মে, শাক-সব্জী উৎপাদিত হয়, অতিথি পাখি সহ বিভিন্ন পাখির বিচরণ হয় সেটিই বাওড়ের জন্য আদর্শ পরিবেশ। দেশী শিং, কৈ, মাগুর,টাকি মাছ, হেলাঞ্চি-কলমি-শাপলা, শালুক প্রভৃতি শাক সব্জী ও মাছ যেমন সুস্বাদু তেমনি এর রয়েছে অপরিসীম ভেষজ ও ঔষধি গুণ। তাছাড়া বাওড়গুলো জীববৈচিত্র্য টিকে থাকার জন্য বড়ো ধরণের একটা আশ্রয়স্থল। সে কারণে বাওড়গুলোকে প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করে অভয়াশ্রম হিসাবে গড়ে তুলতে হবে। তবে সেচের জন্য বাওড় থেকে সীমিত পরিমাণ পানি উত্তোলন করা যেতে পারে। নিঃসন্দেহে এসব বাওড়গুলো ভূ-পৃষ্ঠ ও ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর বৃদ্ধি এবং এলাকায় অনুকূল আবহাওয়া ও জলবায়ু তৈরী করতে সহায়তা করবে।

CEGIS কর্তৃক ঝাঁপা বা খাজুরা বাওড়ে টিআরএম এর প্রস্তাব করা হয়েছে। আমরা এ প্রস্তাবের বিরোধী। এলাকার বাওড়গুলো পলি তুলে ভরাট করা ঠিক হবেনা।

বাওড় ছাড়া এলাকার অনেক বিলে স্থায়ী জলাভূমি আছে যার চারপাশ উঁচু করে জলাধার হিসাবে ব্যবহার করা যায়। অনেক পুকুর ও দীঘিতেও পানি সংরক্ষণ করা যায়।

১৩.৫ শাখা নদীর সাথে সংযোগ সাধন

মহেশপুর শহরের পশ্চিমে সায়েরীঘাট থেকে বেতনা নদী, ঝিকরগাছা থেকে হরিহর নদী এবং ত্রি-মোহিনী থেকে ভদ্রা নদীর উৎপত্তি ঘটেছে। এসব শাখা নদী ও তাহিরপুর থেকে পূর্বদিকে যশোর অভিমুখে ভৈরব নদী এখন মূল নদী থেকে বিচ্ছিন্ন, রাড়ুলী কাটিপাড়া থেকেও কপোতাক্ষের নিম্নাংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। মাথাভাঙ্গা থেকে আগত পানি প্রবাহের সাথে এসব বিচ্ছিন্ন নদীর সংযোগ প্রদান করা যায় কিনা সেটিও ভেবে দেখা যেতে পারে।

শাখা নদীর অববাহিকা সমূহের জলাবদ্ধতার অবস্থাও কপোতাক্ষ অববাহিকার অনুরূপ। তবে এই সব নদীতে কি পরিমাণ পানির সংযোগ দেওয়া যাবে সেটি মূলতঃ নির্ভর করবে মাথাভাঙ্গা থেকে কি পরিমাণ পানি ভৈরব কপোতাক্ষে প্রবেশ ঘটানো যায় তার উপর।

১৩.৬ লুপকাট বা নদী সোজা করা

কপোতাক্ষ ও উপরস্থ ভৈরব নদী এই এলাকার মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন নদী। দীর্ঘ এ নদী পথ অত্যন্ত আঁকাবাঁকা এবং অসংখ্য বাঁকযুক্ত। অতীতে মোগল আমল থেকে ব্রিটিশ সরকার ও নীলকর সাহেবরা এ নদীর অনেক বাঁক সোজা করে কেটেছেন নৌ পথের দূরত্ব কমানোর জন্য। বাঁকযুক্ত ঐসব স্থানগুলো কালক্রমে বাওড়ে পরিণত হয়েছে। এ ধরণের বাঁকযুক্ত নদীকে কেটে সোজা করে দেওয়ার নাম হলো লুপকাট।

কপোতাক্ষ ও উপরের ভৈরবের মধ্যে এখনও অসংখ্য প্রায় ঘূর্ণায়মান বাঁকযুক্ত নদী আছে যা লুপকাটের মাধ্যমে সোজা করে দেওয়ার প্রস্তাব উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। ঐ সব মহলের ধারণা নদী সোজা করে দেওয়া হলে নদী প্রবাহের গতিবেগ বৃদ্ধি পাবে এবং নদীর দূরত্ব হ্রাস পাওয়ার কারণে দ্রুতভাবে পানি নিষ্কাশিত হবে।

আবার অনেকে বলতে চান নদীর স্বাভাবিক প্রবাহে হস্তক্ষেপ করা ঠিক হবে না। অতীতে এ ধরণের হস্তক্ষেপে অনেক বিভ্রাট ঘটেছে। এটি নিঃসন্দেহ যে লুপকাট অংশের পরিত্যক্ত নদী বদ্ধ জলাশয়ে পরিণত হবে এবং যদি সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেওয়া না হয় তাহলে ঐসব এলাকার পানি নিষ্কাশনে সমস্যাও সৃষ্টি হতে পারে। তবে লুপকাটের পরিত্যক্ত অংশের উভয়মুখে এমনভাবে গেট নির্মাণ করা যেতে পারে যাতে পানি ও নৌকা সহজে লুপকাটের মধ্যে চলাচল করতে পারে।

লুপকাট করার জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিবাসীরা সংযোগ খাল তৈরীর ব্যাপারে বিরোধিতা করতে পারে। এসব বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে এবং নদী প্রবাহ, নিষ্কাশন এবং এলাকার যাতে কম ক্ষতি হয় সেদিকে লক্ষ্য করে বিদ্যমান অবস্থা মোকাবেলার জন্য লুপকাট করা যেতে পারে। লুপকাট অংশ পানির জলাধার হিসাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনাও গ্রহণ করা যেতে পারে। লুপকাট অংশ বদ্ধ জলাশয় হিসাবে লীজ প্রদান করা কোনমতেই ঠিক হবে না।

১৪. দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ী সমাধানের জন্য পরিকল্পনা

দীর্ঘমেয়াদী বা স্থায়ী সমাধানের জন্য প্রয়োজন জাতীয় ভিত্তিতে আঞ্চলিক পরিকল্পনা প্রনয়ন ও তার বাস্তবায়ন। দক্ষিণাঞ্চলের নদীই হচ্ছে এলাকার আর্থ-সামাজিক ভৌগলিক ও পরিবেশ ব্যবস্থার প্রাণ। নদী ব্যবস্থার উন্নয়ন ছাড়া অন্য কোনভাবে এখানকার উন্নয়ন টেকসই হবে না। হয়তো আর আমরা পুরনো নদী ব্যবস্থাপনায় ফিরে যেতে পারব না, তবু যত কাছাকাছি যাওয়া যায় সে চেষ্টায় আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

নেটওয়ার্ক ছাড়া নদী টিকতে পারে না। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অধিকাংশ নদীই এখন স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে। উত্তরাঞ্চলের নদীগুলো পদ্মা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার দরুন এ দশা ঘটেছে এবং দক্ষিনাঞ্চলের নদীগুলো পোল্ডার ব্যবস্থার কারনে পরস্পর থেকে বি"ছন্ন হয়ে পড়েছে। এইসব নদীগুলোর মধ্যে পরস্পর আন্তঃসংযোগ তাই নির্ভর করছে পদ্মা নদী থেকে পানি প্রাপ্তি এবং পোল্ডার ব্যবস্থা রিডিজাইন করার উপর। সে কারণে পদ্মা নদী ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত উত্তরাঞ্চলের ও দক্ষিণাঞ্চলের নদীগুলোর পুনরুজ্জীবন ও পানি ব্যবহার পরিকল্পনা কি হবে তা নির্ধারণ করা যাচ্ছে না।

তবে দক্ষিণাঞ্চলের নদীগুলোর মধ্যে পোল্ডার রিডিজাইন করে আন্তঃসংযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব। একথা দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে পোল্ডার ব্যবস্থার রিডিজাইন ছাড়া দক্ষিণ অঞ্চলের উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। পোল্ডার রিডিজাইন কর্মকান্ড শুরু করতে যত বিলম্ব হবে পরিস্থিতি ততই দ্রুত অবনতিশীল হয়ে উঠবে এবং নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।

১৫. জনগণের অংশগ্রহণ ও লোকায়ত জ্ঞানের ব্যবহার

পরিকল্পনাকারী, বাস্তবায়নকারী সংগঠন, সরকার ও প্রশাসন এ কথা যত তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করবে ততই মঙ্গল তা হলো পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনায় জনগণের আগ্রহ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে পরিমান পাওয়া যাবে অন্য কোন কর্মকান্ডে তা সম্ভব নয়। এ সমস্যা মানুষের জীবিকার সমস্যা, বসবাসের সমস্যা এবং চলাচলের সমস্যা। সমস্যা দ্বারা মানুষ জর্জরিত, নিষ্পেষিত এবং দিশেহারা। সুতরাং সমস্যা সমাধানে মানুষকে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করা হলে মানুষ যে পরিমান সাড়া দেবে তা হবে অভাবনীয় এবং অভূতপূর্ব। আমরা সকল মহলকে এ বিষয়টি উপলব্ধি করতে আন্তরিকভাবে আহবান জানাচ্ছি।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে জনগণের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ কথা বলা বাহুল্য যে দেশটা হলো পানির দেশ। পানির সাথে সমঝোতা করে, লড়াই সংগ্রাম করে, বন্ধুত্ব করেই এখানকার মানুষ পানির সাথে বসবাস করেছে। সুতরাং পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়টি তাদের অস্তিত্ব রক্ষার বিষয়টির সাথে জড়িত। এ কাজে জনগণের অর্জিত অভিজ্ঞতার মূল্য অপরিসীম। ইঞ্জিনিয়ার, বিশেষজ্ঞ বা পরিবেশবিদদের উচিত জনগণের এ অভিজ্ঞতার উপর শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং যে কোন পরিকল্পনা প্রণয়নে এ জ্ঞানের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা। অতীতে এ লোকায়ত জ্ঞানকে উপেক্ষা এবং কর্মকাণ্ডে জনগনের অংশগ্রহণ না হওয়াতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড দ্বারা এলাকার মানুষকে ভোগান্তির মধ্যে পড়তে হয়েছে, প্রায় ক্ষেত্রে ঘটেছে উন্নয়ন বিপর্যয় (Development Disaster)। এলাকার মানুষ এসব ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি চায়না।

১৬. উপসংহার

দেশে এখন নতুন সরকার দিন বদলের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন যাত্রা শুরু করেছে। নতুন প্রধানমন্ত্রী এলাকার জনগণকে এ আশ্বাস প্রদান করেছেন যে মহাজোট সরকারের অন্যতম প্রধান কাজ হবে ভবদহ ও কপোতাক্ষ নদের কার্যকরী সমাধান। এলাকার মানুষ এ বক্তব্যে উজ্জীবিত হয়েছে, আশায় বুক বেঁধেছে, জনগণ সেই শুভদিনের অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। ইতিমধ্যে এলাকার নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্যরাও সমস্যা সমাধানে আন্তরিক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। আমরা অত্যন্ত আশাবাদী, আশা করি এলাকার মানুষ এবার আলোর মুখ দেখবে। এলাকার পক্ষ থেকে শুধু দাবী এইটুকু যে, যে কোন প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে যেন জনগণের সাথে মতামত বিনিময় করে গ্রহণ করা হয়, তা না হলে অতীতের মতো বিশাল অংকের টাকা ব্যয় করে ভুল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে এবং উপকারের পরিবর্তে ভোগান্তির পরিমান আরো বৃদ্ধি পাবে।

প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট এরশাদ সাহেবের আমল থেকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার পর্যন্ত সব সরকারই জনগণের দাবীর প্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধরণের কর্মসূচী বাস্তবায়ন করেছে। এলাকার জনগণের মধ্যে এ ধারণা এখন অত্যন্ত দৃঢ়মূল যে, তাদের আন্দোলন-সংগ্রামের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময় যে সব প্রকল্প গ্রহণ করা হয় তাতে জনগণের কোন উন্নয়ন হয় না, ভাগ্যের পরিবর্তন হয় প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট তাদের। শুধু তাই নয়, ঐ সব তথাকথিত প্রকল্প সমস্যার জটিলতা ও কঠিনতা সৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ভূমিকা রাখছে। প্রকল্প গ্রহণ করা হোক-এটির চেয়ে তাই এখন মূল বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে জনগণের সাথে মত বিনিময় করেই যেন প্রকল্প বা কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। তা না হলে যে প্রকল্পই গ্রহণ করা হোক না কেন তা অতীতের মতো কুফল প্রদান করতে পারে।

#####

সংযুক্তি-১

বন্যায় উপচানো স্থান সমূহ- ২০০৮

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	উপচানো স্থানের নাম	দৈর্ঘ্য (কি.মি)
যশোর	ঝিকরগাছা	পানিসরা	• পুরন্দরপুর কলোনীর ধার • মহিনীকাটি/বেজিয়াডাঙ্গা গঙ্গার খাল	৩ কি.মি ৩ কি.মি
		বাঁকড়া	• বালিয়াডাঙ্গা নগর থেকে ঘোষালনগর হয়ে দিকদানা • ঘোষাল নগর থেকে বালিয়া স্লুইজগেট পর্যন্ত • উজ্জলপুর নদীর ধার	৪ কি.মি ৫ কি.মি ৪ কি.মি
		হাজিরবাগ	• হাজিরবাগ শেখপাড়া হতে ইটভাটা পর্যন্ত • রামপটন ইটভাটা হতে বাঁকড়া ব্রীজ পর্যন্ত • সোনাকুড় শেখপাড়া সাদীপুর পর্যন্ত	২ কি.মি ১ কি.মি ১ মি.মি
		নির্বাসখোলা	• নোয়ালী মিস্ত্রীঘাট থেকে বাচ্চু নাজিররের বাড়ী পর্যন্ত	৪ কি.মি
		ঝিকরগাছা	• ঝিকরগাছা হইতে মিশ্রী দেয়াড়া পর্যন্ত	৩ কি.মি
		পৌরসভা	• পুরন্দপুর হতে সাদ্দামপাড়া পর্যন্ত	৩ কি.মি
			• পৌরসভার শেষ সীমানা হতে হাড়িয়া দেয়াড়া পঞ্চনগর শ্মশান ঘাট পায়রা পর্যন্ত	২ কি.মি
	মোট	*০৬*	*১২টি স্থান*	*৩৫ কি.মি*
	মনিরামপুর	মশ্মিননগর	• লক্ষীপুর ব্রীজ থেকে গ্রাম • কিসমত চাকলা মাটশিয়া থেকে খোর্দ্দ ঘাট • চাকলা-খোর্দ্দঘাট মেকেচাকলা বাজার • পারখাজুরা বাজার থেকে হোড়ারজেলকান্দা	০.৫ কি.মি ২ কি.মি ৩ কি.মি ৪ মি.মি
		ঝাঁপা	• মলিকপুর ঝোঁড় থেকে মশ্মিনগর ব্রীজ • মলিকপুর ব্রীজ থেকে চারা বটতলা পর্যন্ত • ঝাঁপা বাজার থেকে ডুমুরখালী মোড়	৩ কি.মি ১ কি.মি ১ কি.মি
		চালুয়াহাটি	• হাকিমপুর ব্রীজ থেকে ইব্রাহীম মোল্যার বাড়ী • মোবারকপুর ব্রীজ থেকে রাজগঞ্জ পর্যন্ত	২ কি.মি ৫০মি.
		হরিহরনগর	• ডুমুরখালী বাজার হতে ঝাপা বাজারের রাস্তা • গোয়াল বাড়ি থেকে পাঁচপোতা পর্যন্ত	৩ কি.মি ৬ কি.মি
	মোট	*০৪*	*১১টি স্থান*	*২৬ কি.মি*
	কেশবপুর	বিদ্যানন্দকাটি	• বগা গেটের দুপাশ নদীর ধার • কাদার খাল গেট নেহালপুর দুধার দিয়ে	১.৫কি.মি ১.৫কি.মি
		ত্রিমোহনী	• বরনডালী হতে সরসকাটি • মির্জানগর চাঁদড়া ভেড়ী বাঁধ	৫.৫কি.মি ২ কি.মি
		সাগরদাঁড়ী	• বিষ্ণুপুর ঈদগাহ হতে গোপসেনা • সাগরদাঁড়ী মালোপাড়া থেকে শেখপাড়া	৭কি.মি ৫ কি.মি
	মোট	*০৩*	*৬টি স্থান*	*২২.৫কি.মি*
সাতক্ষীরা	কলারোয়া	দেয়াড়া	• কাশিয়া ডাঙ্গা থেকে দেয়াড়া • বাজে খোর্দ্দখাল হতে খোর্দ্দ পর্যন্ত • ঘ্যানা সরদারের ঘাট হতে মিয়ার ঘাট পর্যন্ত	১৫কি.মি ০.৫কি.মি ১০ কি.মি
		জয়নগর	• সরসকাটি ব্রীজ হতে জয়নগর সুভাষ মালোর বাড়ী	৫.৫কি.মি

জেলা	*উপজেলা*	*ইউনিয়ন*	*উপচানো স্থানের নাম*	*দৈর্ঘ্য (কি.মি)*
সাতক্ষীরা	তালা	ধানদিয়া	• ধানদিয়া স্কুল হতে কৃষ্ণনগর স্লুইচগেট • সারসা ঈদগাহ হতে চিংড়ী • চিংড়ী খেয়াঘাট থেকে সাগরদাড়ি খেয়াঘাট • সাগরদাড়ী খেয়াঘাট থেকে কুটিঘাটা বাজার	৪ কি.মি ২ কি.মি ১.৫কি.মি ৩.৫মি.মি
		সরুলিয়া	• কাশীপুর কালীবাড়ী থেকে ছোট কাশীপুর শেষ সীমানা • পাটকেলঘাটা ব্রীজ হতে পুটিয়াখালী • আচিমতলা পাটকেলঘাটা ব্রীজ	৭ কি.মি ২.৫কি.মি ২ কি.মি
		কুমিরা	• বগা মাদ্রাসার পাশের খাল হতে স্বরসতী ঘাট	১.৫কি.মি
			• রাড়ীপাড়া মালোপাড়া	২ কি.মি
			• কুমিরা বাসষ্ট্যাণ্ড স্কুল মোড় হতে আচিমতলা পর্যন্ত	৩ কি.মি
			• কুমিরা বাসষ্ট্যাণ্ড হতে পাটকেলঘাটা পুরাতন শ্মশানঘাট	১. কি.মি
			• মন্দির খোলা হতে আচিমতলা	২ কি.মি
		তালা সদর	• তালা বাজার	১ কি.মি
		মাগুরা	• চরগ্রাম নদী তীরবর্তী সকল এলাকা	৩ কি.মি
			• বারইপাড়া নদী তীরবর্তী সকল এলাকা	১ কি.মি
			• মাগুরা নদী তীরবর্তী সকল এলাকা	১.৫ কি.মি
			• চাঁদকাটি নদী তীরবর্তী সকল এলাকা	১.৫ কি.মি
			• ফলেয়া নদী তীরবর্তী সকল এলাকা	১ কি.মি
			• বলারামপুর নদী তীরবর্তী সকল এলাকা	১ কি.মি
		খলিলনগর	• হরিশচন্দ্রকাটি নদী তীরবর্তী সকল এলাকা	১ কি.মি
			• গোনালী নলতা নদী তীরবর্তী সকল এলাকা	৩ কি.মি
			• ঘোষনগর নলতা নদী তীরবর্তী সকল এলাকা	১ কি.মি
			• গংগারামপুর নদী তীরবর্তী সকল এলাকা	১.৫মি.মি
		জালালপুর	• তেঘরিয়া সীমানা হতে শ্রীমন্তকাটি শ্মশান	২ কি.মি
			• জালালপুর পূজামণ্ডপ হতে জালালপুর ঘাট	১ কি.মি
			• জেঠুয়া বাজার হতে জেঠুয়া গ্রাম	৩ কি.মি
			• কানাইদিয়া জহর শেখের বাড়ী হতে বটতলা ঘাট পর্যন্ত	২কি.মি
	মোট	*০৭*	*২৭ টি স্থান*	৪৮.৫কি.মি
সর্বমোট ২টি	*৫টি*	*২২টি*	*৬০টি স্থান*	*১৬৩ কি.মি*

সংযুক্তি- ২ জোয়ারের ভাঙ্গন ও প্লাবন স্থান সমূহ

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	জোয়ারের ভাঙ্গন ও পাবনের স্থান	কত বৎসর	সমস্যা সমূহ
সাতক্ষীরা	তালা	সরুলিয়া	পাটকেলঘাটা বাজার ভাঙ্গন	১৫	শতাধিক দোকান নদীগর্ভে বিলীন
		জালালপুর	শ্রীমন্তকাটি চর ভাঙ্গন	২০	৫০ একর জমি বিলীন
			জেঠুয়া হাট ভাঙ্গন ও প্লাবন	২০	২০টি দোকান নদীগর্ভে বিলীন
			জেঠুয়া মালোপাড়া ও ঘোষপাড়া ভাঙ্গন	৩০	চার শতাধিক ঘর নদীগর্ভে বিলীন
		খেশরা	বালিয়া বাজার ভাঙ্গন ও প্লাবন	৭	বাজার প্লাবিত হয়ে গ্রাম তলিয়ে যাচ্ছে
			গোড়ার ঘের বিল প্লাবন	৭	ঘের, ধানবাড়ী তলিয়ে যাচ্ছে।
			মাদে বিল ও খোল বিল ভাঙ্গন ও প্লাবন	৭	ঘের, ধানবাড়ী তলিয়ে যাচ্ছে।
		ইসলামকাটি	রক্ষাকালী তলা থেকে বাউখোলা বটতলা পর্যন্ত প্লাবন	৪	বাজার, ধানক্ষেত, রাস্তা প্লাবিত হয়
		মাগুরা	মাগুরা বাজার ভাঙ্গন ও প্লাবন	৫	বাজার, রাস্তা প্লাবিত হয়
		তালা	মেলাখোলা থেকে হরিশচন্দ্রকাটি কালভার্ট পর্যন্ত ভাঙ্গন ও প্লাবন	৫	বাজার, রাস্তা ও ধানক্ষেত
খুলনা	পাইকগাছা	গদাইপুর	বোয়ালে খেয়াঘাট হিতামপুর গ্রাম ভাঙ্গন ও প্লাবন	১০	ভাঙ্গনে বাড়ীঘর নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে ৩ কি.মি
		হরিঢালী	মাহমুদকাটি খেয়াঘাট থেকে আগড়ঘাটা বাজার ভাঙ্গন ও প্লাবন	১৭	ভাঙ্গনে বাড়ীঘর নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে ৩ কি.মি
			হরিদাসকাটি বিলের পশ্চিম মাথায় ভাঙ্গন	২০	ফসলী জমি নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে।
			রহিমপুর থেকে দেয়াড়া সাদেক আলীর বাড়ী পর্যন্ত ভাঙ্গন ও প্লাবন	১৭	ফসলী জমি ও বাড়ী নদীগর্ভে বিলীন হচ্ছে।
			হাবিবনগর থেকে দরগামহাল	৮	ভাঙ্গন চলছে
			উত্তর সনাতনকাটি শেখ পাড়া লঞ্চঘাট	১২	নদীগর্ভে বিলীন
		কপিলমুনি	কাশিমনগর মালোপাড়া থেকে কালীবাড়ী পর্যন্ত ভাঙ্গন ও প্লাবন	১২	বাজার ও বাড়ীঘর প্লাবিত হচ্ছে ও ভাঙ্গন কবলিত হচ্ছে।
		রাড়ুলী	শ্রীকণ্ঠপুর বগুড়ার বিলের গেট সংলগ্ন ভাঙ্গন	১	ওয়াপদার বাঁধ নদীগর্ভে বিলীন
সর্বমোট ২টি	২টি	১০টি			

সংযুক্তি- ৩

ব্রীজের তালিকা

দর্শনা থেকে পাইকগাছার শিববাড়ী পর্যন্ত

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	ব্রীজের নাম ও স্থান
চুয়াডাঙ্গা	দামুড়হুদা	দর্শনা পৌরসভা	দর্শনা চেক পোস্ট রেল ব্রীজ।
	জীবননগর	উথলী	সিংহনগর ব্রীজ।
	চুয়াডাঙ্গা সদর	বেগমপুর	রিঙ্গের পোতা ব্রীজ।
	জীবননগর	উথলী	সন্তোষপুর ব্রীজ, মনোহরপুর ব্রীজ, ধোপাখালী ব্রীজ।
		জীবননগর (পৌরসভা)	লক্ষীপুর ব্রীজ, পুরাতন লোহার ব্রীজ।
		বাঁকা	বাঁকা ব্রীজ, বালিহুদা ব্রীজ, কাটা পোল ঘাট ব্রীজ, মিনহাজপুর ব্রীজ।
		আন্দুলবাড়ীয়া	কাশীপুর ব্রীজ (আন্দুল বাড়ীয়া পশ্চিম বাজার)।
ঝিনাইদহ	মহেশপুর	এস.কে.বি	খালিশপুর ব্রীজ, ভালাইপুর ব্রীজ।
		মহেশপুর (পৌরসভা)	মহেশপুর কলেজ ব্রীজ।
		আজমপুর	যুগীহুদা ব্রীজ।
	কোটচাঁদপুর	কোটচাঁদপুর	কোটচাঁদপুর ব্রীজ।
যশোর	চৌগাছা	হাকিমপুর	তাহিরপুর ব্রীজ। (কপোতাক্ষের উৎপত্তিস্থল মুখে)
		নারায়নপুর	নারায়ন ব্রীজ। (নির্মাণাধীন) পিলার পোতা হয়েছে।
		চৌগাছা (পৌরসভা)	চৌগাছা বেইলী ব্রীজ। (যশোর মহেশপুর রোড)।
	ঝিকরগাছা	গংগানন্দপুর	কাবিলপুর ব্রীজ,ধুলিয়ানী ব্রীজ, ছুটিপুর ব্রীজ।
		ঝিকরগাছা	ঝিকরগাছা বাজার ব্রীজ। (গ্রান্ড-ট্রাংক রোড)
		পৌরসভা	ঝিকরগাছা রেল ব্রীজ।
		পানি সরা	বেজিয়াতলা ব্রীজ।
		নির্বাসখোলা	কানাইরালী ব্রীজ।
		বাঁকড়া	বাঁকড়া ব্রীজ, উজ্জ্বলপুর ব্রীজ। (নির্মাণাধীন)
	মনিরামপুর	ঝাঁপা	মলিকপুর ব্রীজ।
		মশ্মিমনগর	মশ্মিমনগর ব্রীজ, লক্ষী কান্তপুর ব্রীজ।
	কেশবপুর	ত্রিমোহিনী	সরসকাটি ব্রীজ।
সাতক্ষীরা	তালা	সরুলিয়া	পাটকেলঘাটা ব্রীজ।
		তালা	তালা ব্রীজ।
খুলনা	পাইকগাছা	কপিলমুনি	কপিলমুনি ব্রীজ।(নির্মাণ কাজ চলছে)।
		পাইকগাছা (পৌরসভা)	শিববাড়ী ব্রীজ।
৫টি জেলা	১২টি উপজেলা	২৭টি ইউনিয়ন	৩৮টি ব্রীজ, ৩টি নির্মাণাধীন, ২টি রেল ব্রীজ

সংযুক্তি- ৪

কপোতাক্ষ নদের উপর সাঁকো ও চারের তালিকা

ঘোষনগর থেকে গঙ্গানন্দপুর পর্যন্ত

ক্র.নং	সাঁকো ও চারের নাম	স্থান	ইউনিয়ন	উপজেলা	জেলা	কিসের তৈরী
১.	হিজলতলী	হিজলতলী	গঙ্গানন্দপুর	ঝিকরগাছা	যশোর	বাঁশের তৈরী
২.	ফুলতলা	ফুলতলা	মাগুরা	”	”	”
৩.	পুরন্দরপুর কলোনী	স্মরনপুর	পানিসরা	”	”	”
৪.	চিংড়ী বাজার	চিংড়ী	সাগরদাঁড়ী	কেশবপুর	”	”
৫.	মাইকেল বাড়ী	সাগরদাঁড়ী	”	”	”	”
৬.	উত্তর সারসা	সারসা	ধানদিয়া	তালা	সাতক্ষীরা	”
৭.	ঘোষনগর সাঁকো	ঘোষনগর	খলিলনগর	”	”	”

সংযুক্তি- ৫

স্লুইজ গেটের তালিকা (কপোতক্ষ নদ)

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	স্লুইজ গেটে নাম ও স্থান	ভেন্ট সংখ্যা	কি কি ত্রুটি আছে	মন্তব্য
সাতক্ষীরা	তালা	তালা	গোপালপুর স্লুইজ গেট	৫	ভার্টিকেল কপাট নষ্ট, নাট নষ্ট, রাবার নষ্ট	বর্তমান ঠিক করা হয়েছে
			তালা পুরাতন থানা স্লুইজ গেট	১	কপাট নষ্ট। পলিভরাট	
		জালালপুর	জালালপুর স্লুইজ গেট	৪	৪টি কপাট ভাঙ্গা, রাবার গুলি নষ্ট, পলি ভরাট	
			জেঠুয়া গ্রাম স্লুইজ	২	১টি হুইল ও ৪টি রাবার নষ্ট, পলিভরাট।	
			জেঠুয়া ৪৬নং প্রোজেক্ট গেট	২	১টি হুইল নষ্ট। পলিভরাট।	
			কৃষ্ণকাটি বিল গেট	১	কপাট নষ্ট। পলিভরাট।	
		খেশরা	ডুমুরিয়া স্লুইজ গেট	২	অটো জোয়ার-ভাটা হচ্ছে গেট নষ্ট।	জোয়ার উঠে,নামে না
			উত্তর শাহাজাদপুর	১	গেট ভেঙ্গে গেছে।	
			খোল বিলের গেট	১	নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে গত বছর।	
খুলনা	পাইকগাছা	হরিঢালী	শ্রীরামপুর নোয়াকাটী স্লুইজ গেট	১	অটো পানি ওঠে, কালভার্ট System ।	
		রাড়ুলী	ভড়ভড়িয়া গেট	১	লোহার কপাট ভাংগা, কাঠের সমস্যা।	
			শ্রীকণ্ঠপুর স্লুইজ গেট	১	নদী ভরাটে Function হয় না।	
		গদাইপুর	চার বিলের গেট (হিতামপুর)	১	১টি পাট কাঠের, অন্যটি লোহার।	
			বোয়ালিয়া কৃষি ফার্ম স্লুইজ গেট	২	ভাল আছে।	
		পাইকগাছা পৌরসভা	শিববাড়ী স্লুইজ গেট	১	পাট নষ্ট, উভয় পাশে তক্তা দেওয়া।	
জেলা ৩টি	*৭টি*	*২৩টি ইউঃ (৩টি পৌরঃ)*	*৪৫টি স্লুইজ গেট*			

সংযুক্তি- ৫

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	স্লুইজ গেটের নাম ও স্থান	ভেন্ট সংখ্যা	কি কি ত্রুটি আছে	মন্তব্য
যশোর	চৌগাছা	চৌগাছা পৌরসভা	পাঁচ নামিয়া স্লুইজ গেট	৩	ভিতরে বাহিরে খাল ভরাট	
			কুটিপাড়া স্লুইজ গেট	১		
	ঝিকরগাছা	ঝিকরগাছা পৌরসভা	কাটাখাল স্লুইজ গেট	৭	স্প্রিং এর ত্রুটি।	
			কাটাখাল এ চ্যানেল	৪		
		বাঁকড়া	দীগদানা স্লুইজ গেট	২	রাবার সমস্যা,পেট ছিদ্র, পলি ভরাট।	
			উজ্জ্বলপুর স্লুইজ গেট	১	জলে ডোবানো, পলি ভরাট।	
			খলশি	২	রাবার ও পেট নেই।	
	মনিরামপুর	চালুয়াহাটি	মোবারকপুর-মনোহর পুর কালভার্ট	১	নিয়ন্ত্রন কাঠামো নেই।	
			হাকিমপুর কালভার্ট	১	নিয়ন্ত্রন কাঠামো নেই।	
		ঝাঁপা	মলিকপুর কালভার্ট	১	নিয়ন্ত্রন কাঠামো নেই।	
			পার খেজুরা কালভার্ট	১	নিয়ন্ত্রন কাঠামো নেই।	
			পাজাখোলার ঘাট কালভার্ট	১	নিয়ন্ত্রন কাঠামো নেই।	
		মশ্মিমনগর	হোড়ার জেলা কাঁদা	২	দুপাশে নীচু ২ফুট, পাশে পলি ভরাট ।	
			লক্ষীকান্তপুর কালভার্ট	১	নিয়ন্ত্রন কাঠামো নেই।	
	কেশবপুর	ত্রিমোহিনী	মীর্জানগর ওয়াপদা স্লুইজ গেট	১	পাখা খাটো ২ফুট, পলি ভরাট পাশে।	
			বরণডালী ওয়াপদা স্লুইজ গেট	১		
		সাগরদাঁড়ী	মেহেরপুর ওয়াপদা স্লুইজ গেট	১	পাখা নাই পলি ভরাট।	
		বিদ্যানন্দকাটি	বগা স্লুইজ গেট	১	বহুদিন বন্ধ, পলি ভরাট	
			কাদার খাল স্লুইজ গেট (নেহালপুর)	১		
সাতক্ষীরা	কলারোয়া	যুগীখালী	বামনালী স্লুইজ গেট	১	কন্ট্রোল System নাই,পলি ভরাট বর্তমানে বাঁধদেওয়া River Side-এ	
			ওফাপুর স্লুইজ গেট	২		
		জয়নগর	জয়নগর স্লুইজ গেট	২	পলি ভরাট, কপাট নাই।	
			ক্ষেত্রপাড়া স্লুইজ গেট	২	পলিভরাট, অকেজো।	
		দেয়াড়া	খোর্দ্দ দুলইপুর বাওড় স্লুইজ গেট	৩	রাবার সীল নেই, পলি ভরাট।	
	তালা	ধানদিয়া	কাটাখালী স্লুইজ গেট	৩	পলিভরাট, ২টি কপাট নাই।	
			কুটিঘাটা বাজার স্লুইজ গেট	২	পলিভরাট, সম্পূর্ণ নষ্ট বিকল।	
		সরুলিয়া	সরুলিয়া গেট	৩	যন্ত্রপাতি বিকল, উপরিভাগ ভেঙ্গে গেছে।	
		ইসলামকাটি	ইসলামকাটি স্লুইজ গেট	১	বিকল, পলিভরাট উভয়পাশে।	
		মাগুরা	মাগুরা স্লুইজ গেট	১	বিকল, পলিভরাট।	
			বলরামপুর স্লুইজ গেট	১	গেট (তালা দেওয়া)।	

সংযুক্তি- ৭ *কপোতাক্ষ ও ভৈরব ক্যাচমেন্টে বাওড়ের তালিকা*

জেলা	*উপজেলা*	*ইউনিয়ন/ পৌরসভা*	*বাওড়ের নাম ও স্থান*
চুয়াডাঙ্গা ৬টি	জীবননগর ৬টি	উথলী	সিংনগর বাওড়, উথলী বাওড়, সন্তোষপুর বাওড়,
		বাঁকা	মারুফদহ বাওড়, কৃষ্ণপুর বাওড়
		আন্দুল বাড়ীয়া	ঘুগরোগাছি বাওড়
ঝিনাইদহ ৯টি বাওড়	মহেশপুর ৮টি	ফতেপুর	ফতেপুর বাওড়, একতারপুর বাওড়
		মহেশপুর পৌঃ	হামিদপুর বাওড়, বগা বাওড়
		এসকেবি	বজ্রপুর বাওড়, কাকিলাদাড়ী বাওড়
		মান্দার বাড়ীয়া	কাঠগড়া বাওড়
		আজমপুর	আলমপুর বাওড়
	কোটচাঁদপুর ১টি	বলুহর	বলুহর বাওড় (কাকমারী বাওড়)
যশোর ২৪টি বাওড়	চৌগাছা ৪টি	পাতিবিলা	মরজাত বাওড়
		দেয়াড়া	বুকভরা বাওড়
		স্বরুপদহ	খড়িঞ্চী বাওড়
		ধূলিয়ানী	ফতেপুর বাওড় (চৌগাছা)
	ঝিকরগাছা ১১টি	গংগানন্দপুর	কাকমারী বাওড়
		ঝিকরগাছা	শ্রী রামপুর বাওড়
		নির্বাস খোলা	টেপির বাওড় (কানাইরালী), সাদীপুর বাওড়
		হাজিরবাগ	বেতনী বাওড়, সোনাকুড় বাওড়
		বাঁকড়া	উজ্জ্বলপুর বাওড়, বিল কচুয়া বাওড়
		পানিসরা	রাজাপুর বাওড়, মোহিনীকাটি বাওড়, রঘুনাথনগর বাওড়
	মনিরামপুর ৭টি	মশ্মিননগর	পার খেজুরা বাওড়
		ঝাঁপা	ঝাঁপা বাওড়
		খেদাপাড়া	খেদাপাড়া বাওড়
		হরিহরনগর	খাটুরা বাওড়, একটি বিল বাওড়, মড়গাং বিল বাওড়, গোয়াল বাড়ি বাওড়
	কেশবপুর ২টি	ত্রিমোহিনী	ঘুনা বাওড়, মশনিয়া বাওড়
সাতক্ষীরা ৩টি বাওড়	কলারোয়া ৩টি	যুগীখালী	গোচমারা বাওড়
		দেয়াড়া	খোর্দ্দলইপুর বাওড়, দেয়াড়া-সোনাতলা বাওড়
সর্বমোট	*৮টি উপজেলা*	*২৬টি ইউনিয়ন*	*৪২টি বাওড়।*

কপোতাক্ষ অববাহিকায় বন্যা কবলিত ও জলাবদ্ধ মানুষের মাঝে উত্তরণে'র মেডিক্যাল ক্যাম্প

Uttaran

actionaid